الـهـكـم الـتـكـاثـر ۔ حـتـى زرتـم الـمـقـابـر

ধন-সম্পদের প্রতিযোগিতা তোমাদিগকে আখেরাত বিমুখ করিয়া রাখে। এমনকি তোমরা কবরে পৌঁছিয়া যাও।

ধন-সম্পদের লোভ ও কৃপণতা

মূল

ইমাম গায্যালী (রহ)

অনুবাদ-

মাওলানা মতিউর রহমান

প্রকাশনায়

মোহাম্মদী লাইব্রেরী

চকবাজার, ঢাকা-১২১১

বিষয় **সূচিপত্র** পৃষ্ঠা

বিষয়	পৃষ্ঠা

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّى عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ

হামদ ও সালাত

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহপাকের যিনি সমস্ত প্রশংসার অধিকারী যেহেতু বান্দার জন্য রিযিকের দ্বার সুপ্রশস্ত করিয়া দিয়াছেন, যিনি নিরাশার পর বিপদ হইতে মুক্তি দান করিয়াছেন, সমস্ত মাখলুক সৃষ্টি করত; তাহাদের রিযিকের ব্যবস্থা করিয়াছেন, সমগ্র জাহানে বিভিন্ন প্রকার ধন-সম্পদের স্রোত বহাইয়া দিয়াছেন, লোকদিগকে অবস্থার পরিবর্তনের মাধ্যমে পরীক্ষা করিয়াছেন সুখ-দুঃখ, ঐশ্বর্য ও দারিদ্র আশা ও নিরাশা, ক্ষমতা ও অক্ষমতা, লোভ ও তুষ্টি, কার্পণ্য ও বদান্যতা, বিদ্যমান বস্তুর জন্য আনন্দ প্রকাশ ও হারানো জিনিসের জন্য দুঃখ প্রকাশ, সম্পদ আটকাইয়া রাখা ও আল্লাহর পথে ব্যয় করা, প্রাচুর্য ও অভাব অপচয় ও হাত গুটাইয়া রাখা, অল্পেতুষ্টি ও অধিকের আশা এই সব বিভিন্ন অবস্থা সৃষ্টি করিয়াছেন মানুষকে পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে যে, কে উত্তম আমল করে, কে দুনিয়াকে আখেরাতের উপর অগ্রাধিকার দেয়, আখেরাত হইতে মুখ ফিরাইয়া দুনিয়া অর্জনের পিছনে পড়ে অসংখ্য দুরূদ ও সালাম হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর প্রতি যিনি আপন দ্বীন দ্বারা সমস্ত দ্বীনের অবসান ঘটাইয়াছেন আর তাহার সহচর বৃন্দ ও পরিবারবর্গের প্রতি যাহারা আপন রবের পথে বাধ্যগত ও অনুগত হইয়া চলিয়াছেন।

কৃপনতা ও ধন-সম্পদ প্রেমের নিন্দা

মনে রাখিতে হইবে যে, দুনিয়ার ফেতনা বিভিন্ন প্রকারের, তন্মধ্যে সবচাইতে বড় ফেতনা হইল মালের ফেতনা এবং সবচাইতে কষ্ট ও ইহাতেই। আর এই ফেতনা সব চাইতে খারাপ হওয়ার কারণ হইল মাল মাল ছাড়া কেহ চলিতে পারে না, অতঃপর মাল লাভ হইলে নিরাপত্তা থাকে না আর লাভ না হইলে দারিদ্র জীবন যাপন করিতে হয় যাহা কুফরের দিকে পৌছাইয়া দিতে পারে। আর মাল থাকিলে এমন অবাধ্যতা সৃষ্টি হয় যাহার পরিনাম ক্ষতি বৈ আর কিছু নহে। মোটকথা ইহা উপকার ও আপদ মুক্ত নহে। উপকার ও অপরিত্রান দাতা আর আপদ ধ্বংসাত্মক। ইহার ভাল মন্দ পার্থক্য করার ক্ষমতা একমাত্র জ্ঞানী ও বিজ্ঞ আলেমদেরই রহিয়াছে, নিছক নামধারীদের নহে। তাই ইহা ভিন্ন ভাবে বর্ণনা করা একান্ত প্রয়োজন। পূর্বে যাহা বর্ণিত হইয়াছে তাহা ছিল সাধারণ দুনিয়ার নিন্দা সম্পর্কিত, মাল সম্পর্কে বিশেষ ভাবে বর্ণনা করা হয় নাই। কেননা দুনিয়া বলিতে মানব জীবনের দুনিয়াবী ভোগ্য বস্তুকে বুঝানো হয়, ইহার বহু

অংশ রহিয়াছে তন্মধ্যে একটি হইল মাল। আর একটি হইল মর্যাদা, আরেকটি হইল পেট ও লজ্জাস্থানের শাহওয়াতের আনুগত্য, আরেকটি হইল গোস্বা ও হিংসার মাধ্যমে অন্তরের ক্ষিপ্ততা দূরীভূত করা, আরেকটি হইল অহংকার ও বড়াই, মোটকথা ইহার বহু অংশ রহিয়াছে, এক কথায় পার্থিব জীবনের স্বাদ বলিতেই দুনিয়া। কিন্তু এই অধ্যায়ে শুধু মাল সম্পর্কে আলোচনা করিব যেহেতু ইহাতে বহু আপদ ও ক্ষতি রহিয়াছে। অধিকন্তু এই মাল লাভ হওয়ার মধ্যে রহিয়াছে স্বচ্ছলতা, আর লাভ না হওয়ার মধ্যে রহিয়াছে দারিদ্র। আর এই দুইটি এমন অবস্থা, যা দ্বারা মানুষকে পরীক্ষা করা হয়। অনন্তর দরিদ্র ও মালহীন ব্যক্তির দুই অবস্থা হইতে পারে। অল্পেতুষ্টি ও লোভ, তন্মধ্যে একটি প্রশংসনীয় আরেকটি নিন্দনীয়। লোভী ব্যক্তির আবার দুই অবস্থা হইতে পারে। অপরের হাতে যে মাল রহিয়াছে উহার লোভ করা আরেকটি হইল অন্যের মালের আশা না করিয়া কোন পেশা ও কাজ অবলম্বন করত; মাল অর্জন করা। এই দুইটির মধ্যে অপরের মালের প্রতি লোভ করা সবচাইতে খারাপ।

এমনি ভাবে মালদারেরও দুইটি অবস্থা হইতে পারে, কার্পণ্য করত: মাল আটকাইয়া রাখা আরেকটি হইল খরচ করা। তন্মধ্যে একটি নিন্দনীয় অপরটি প্রশংসনীয়। আর খরচকারীরও দুই অবস্থা হইতে পারে। অতি খরচ করা যাহাকে অপচয় বলে আরেকটি হইল পরিমিত মাত্রায় খরচ করা। এই শেষোক্ত উক্তিটিই সব চাইতে প্রশংসনীয়।

এই সমস্ত বিষয় জটিল বিধায় প্রত্যেকটিকে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে অন্য রূপে বর্ণনা করা একান্ত প্রয়োজন। এই সমুদয় বিষয় ইনশাআল্লাহ বর্ণনা করিব।

মালের নিন্দা

মালের নিন্দা সম্পর্কিত বিভিন্ন আয়াত। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُلْهِكُمْ اَمْوَالُكُمْ وَلَا اَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَاُولٰئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ -

"হে ঈমানদারেরা! তোমাদের মাল এবং সন্তান সন্ততি যেন তোমাদিগকে আল্লাহর স্মরণ হইতে গাফেল না করে। যাহারা এইরূপ করিবে তাহারা ক্ষতিগ্রস্ত।

اِنَّمَا اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللّٰهُ عِنْدَهٗ اَجْرٌ عَظِيْمٌ

"তোমাদের মাল ও সন্তান সন্তুতি নিছক ফেতনা, আর আল্লাহর কাছে বিরাট প্রতিদান রহিয়াছে।"

অতএব যে ব্যক্তি আল্লাহর কাছে যে প্রতিদান রহিয়াছে উহার মোকাবিলায় মাল ও সন্তান সন্তুতিকে অগ্রাধিকার দিবে সে অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্থ।

আল্লাহ তায়ালা অন্যত্র ইরশাদ করেন -

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِيْنَتَهَا نُوَفِّ اِلَيْهِمْ اَعْمَالَهُمْ فِيْهَا وَهُمْ فِيْهَا لَايُبْخَسُوْنَ -

"যাহারা পার্থিব জীবন ও উহার চাকচিক্য কামনা করে, আমি এই জীবনে তাহাদিগকে তাহাদের আমলের পূর্ণ প্রতিদান দিয়া দেই এবং ইহাতে কোন প্রকার ত্রুটি করা হয় না।"

اِنَّ الْاِنْسَانَ لَيَطْغٰى اَنْ رَّاٰهُ اسْتَغْنٰى-

"মানুষ যেহেতু নিজেকে ধনী ও অপ্রত্যাশী দেখে তাই সে অবাধ্যতা শুরু করিয়া দেয়।"

মহান আল্লাহর তৌফিক ছাড়া নেককাজ করার ও মন্দ কাজ হইতে বিরত থাকার কোন ক্ষমতা নাই।

আল্লাহ তায়ালা আরো ইরশাদ করিয়াছেন -

اَلْهٰكُمُ التَّكَاثُرُ

"প্রাচুর্যের লিপ্সা তোমাদিগকে গাফেল করিয়া রাখিয়াছে"

মালের নিন্দায় বিভিন্ন হাদীছ

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলিয়াছেন, মাল ও মর্যাদার ভালবাসা অন্তরে এমন ভাবে নেফাক সৃষ্টি করে যেমনিভাবে পানির সাহায্যে তরকারি উৎপন্ন হয়।

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, দুইটি ক্ষুধার্ত নেকড়ে বাঘ যদি একটি ছাগলের পালের মধ্যে ছাড়িয়া দেওয়া হয় তবে যতটুকু ক্ষতি সাধন করিবে উহার চাইতে বেশী ক্ষতি সাধন করে, মাল ও মর্যাদামোহ এক জন মুসলমানের দ্বীনের ব্যাপারে।

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, মালদারেরা ধ্বংস প্রাপ্ত, তবে ঐ মালদার যে আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে চতুর্দিক হইতে মাল বন্টন করে। আর এমন লোক খুবই কম।

একদা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) -এর নিকট আরজ করা হইল, ইয়া রাসূলুল্লাহ আপনার উম্মতের মধ্যে সব চাইতে খারাপ কাহারা? উত্তরে বলিলেন, ধনাঢ্যরা।

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলিয়াছেন, তোমাদের পরবর্তী যুগে এমন কিছু লোক আসিবে যাহারা উৎকৃষ্ট ও বিভিন্ন প্রকারের খাদ্য খাইবে,

উৎকৃষ্ট দ্রুতগামী ঘোড়ায় আরোহন করিবে, সুন্দর ও সুশ্রী মহিলাদিগকে বিবাহ করিবে। উত্তম ও উন্নত মানের বিভিন্ন ধরনের পোশাক পরিধান করিবে, তাহাদের উদর অল্পে পূর্ণ হইবেনা, নফস অধিক পাইয়াও তুষ্ট হইবেনা, সকাল সন্ধ্যা দুনিয়ার পিছনেই মেহনত করিবে, ইহাই তাহাদের প্রধান লক্ষ্য থাকিবে; ইহাকেই তাহারা আপন ইলাহ ও রব মনে করিবে এবং আপন খাহেশে ও প্রবৃত্তির আনুগত্য করিবে। মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহর পক্ষ হইতে কসম (অর্থাৎ কসম দিয়া বলিতেছি) যে, তোমাদের সন্তান সন্তুতি অথবা তাহাদের পরবর্তীদের কেহ যদি ঐ যুগ পায় তবে সে যেন তাহাদিগকে সালাম না করে, তাহাদের রুগ্ন ব্যক্তিকে যেন দেখিতে না যায়, তাহাদের মৃত ব্যক্তির জানাযার নামায যেন না পড়ে, তাহাদের বয়োজ্যোষ্ঠের সম্মান যেন না করে। কেহ যদি এইরূপ করে তবে সে ইসলাম কে ধ্বংস করিয়া দেওয়ার কাজে সহযোগিতা করিল।

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলিয়াছেন, দুনিয়া দুনিয়াদারদের জন্য ছাড়িয়া দাও। যে ব্যক্তি প্রয়োজনাতিরিক্ত দুনিয়া গ্রহণ করে সে আপন মৃত্যু অর্জন করে কিন্তু সে টেরও পায় না।

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলিয়াছেন, মানুষে বলে, আমার মাল, আমার মাল অথচ হে আদম সন্তান। তোমার মাল বলিতে ইহাই যাহা তুমি ভক্ষন করত: শেষ করিয়া দিয়াছ অথবা পরিধান করত: পুরাতন করিয়া ফেলিয়াছ অথবা দান করত: আল্লাহর হুকুম পালন করিয়াছ।

জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) -এর খেদমতে আরজ করিল, ইয়া রাসূলুল্লাহ কি ব্যাপার? মৃত্যু যে আমার কাছে ভাল লাগে না? রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জিজ্ঞসা করিলেন, তোমার মাল আছে কি? সে বলিল, জ্বি হ্যাঁ, ইয়া রাসূলুল্লাহ! রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলিলেন, ঐ মাল আখেরাতের জন্য সদকা করিয়া দাও। কেননা মু-মেনের অন্তর মালের সহিত থাকে। যদি সদকা করিয়া দেয় তবে ঐ মালের সহিত যাইয়া মিলিতে চাহিবে আর যদি দুনিয়াতে রাখিয়া যায় তবে উহার সহিত দুনিয়াতে থাকিয়া যাওয়ার আকাঙ্খা করিবে।

মানুষের বন্ধু তিনটি

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলিয়াছেন, মানুষের বন্ধু তিনটি। তন্মধ্যে একটি তাহার সহিত মৃত্যু পর্যন্ত থাকে। দ্বিতীয়টি কবর পর্যন্ত যায় আর তৃতীয়টি হাশরের ময়দান পর্যন্ত যায়। মৃত্যু পর্যন্ত যেইটি তাহার সহিত থাকে ঐটি হইল মাল। কবর পর্যন্ত যেইটি তাহার সহিত যায় ঐটি হইল পরিবার পরিজন আর যেইটি হাশরের ময়দান পর্যন্ত যায় ঐটি হইল তাহার আমল।

দুনিয়ার ভালবাসা না থাকার বরকত

হযরত ঈসা (আঃ) এর সহচর হাওয়ারীরা তাহাকে বলিল, কি ব্যাপার?

আপনি পানির উপর দিয়া হাটিতে পারেন। কিন্তু আমরা পারিনা? হযরত ঈসা (আঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন তোমাদের কাছে টাকা পয়সার মর্যাদা কিরূপ ? তাহারা বলিল, খুব ভাল। হযরত ঈসা (আঃ) বলিলেন, আমার কাছে টাকা পয়সা এবং মাটির ঢিলা এক সমান।

হযরত আবু দারদা (রাঃ) -এর প্রতি হযরত সালমান ফারসী (রাঃ) -এর চিঠি

হযরত সালমান ফারসী (রাদিঃ) হযরত আবু দারদা (রাদিঃ) এর নিকট লিখিয়া পাঠাইলেন, হে ভাই; তুমি এই পরিমান সঞ্চয় করিওনা যাহার শোকরিয়া আদায় করিতে পারিবেনা। কেননা আমি (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বলিতে শুনিয়াছি, যে মালদার আপন মাল আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী খরচ করিয়াছে কেয়ামতের দিন তাহাকে হাজির করা হইবে এবং তাহার মাল তাহার সম্মুখে রাখা হইবে সে পুলসিরাতের উপর এদিক ওদিক হেলিতে শুরু করিবে তখন তাহার মাল তাহাকে বলিবে, যাও তুমি আমার মধ্য হইতে আল্লাহর হক আদায় করিয়াছ। অতঃপর এমন ব্যক্তিকে হাজির করা হইবে যে স্বীয় মাল আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী খরচ করে নাই এবং তাহার সম্মুখে তাহার মাল রাখা হইবে। যখন সে পুলসিরাতের উপর হেলিতে শুরু করিবে তখন তাহার মাল বলিবে, তুমি ধ্বংস হও, তুমি আল্লাহর হক আদায় কর নাই কেন? অতঃপর তাহার এমনি অবস্থা চলিতে থাকিবে পরিশেষে সে ধ্বংস ও মৃত্যুকে ডাকিতে থাকিবে।

পূর্বে যুহ্দ (দুনিয়া বিরাগ) ও দারিদ্র অধ্যায়ে ধনের নিন্দা ও দারিদ্রের প্রশংসায় যাহা কিছু বর্ণনা করা হইয়াছে ঐ সব কিছুর সম্পর্কই মালের নিন্দার সহিত। তাই সেইগুলির পুনরাবৃত্তি করত: আলোচনা দীর্ঘ করিবনা, এমনিভাবে দুনিয়ার নিন্দা সম্পর্কিত আলোচনাও মালের নিন্দাকে শামিল করে। কেননা মাল দুনিয়ার সর্বপ্রধান বস্তু। তবে এই ক্ষেত্রে বিশেষ ভাবে মাল সম্পর্কে যে সমস্ত হাদীছ ও আসর (সাহাবী ও পরবর্তীদের উক্তি) বর্ণনা করিব।

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলিয়াছেন, বান্দা যখন মারা যায় তখন ফেরেশতারা বলে, কি পাঠাইয়াছে [১] ? আর মানুষে বলে কি রাখিয়া গিয়াছে? রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আরো বলিয়াছেন, তোমরা জমি বৃদ্ধি করিওনা তাহা হইলে দুনিয়াকে ভালবাসিতে শুরু করিবে।

হযরত আবু দারদা (রাঃ) -এর অভিনব বদ দোয়া

বর্ণিত আছে, জনৈক ব্যক্তি হযরত আবু দারদা (রাঃ) এর সহিত খারাপ আচরণ করিয়াছিল। আবু দারদা (রাঃ) ইহার পরিপ্রেক্ষিতে বলিলেন হে আল্লাহ। যে আমার সহিত এইরূপ আচরণ করিয়াছে তাহাকে সুস্থ রাখ, তাহার হায়াত

টাকা - (১) অর্থাৎ মৃত্যুর আগে সে কি আমল আখেরাতের দিকে পাঠাইয়াছে।

বৃদ্ধি করিয়া দাও এবং তাহার মাল বৃদ্ধি করিয়া দাও।

লক্ষ্য করুন, হযরত আবু দারদা (রাঃ) বদদোয়া স্বরূপ মাল বৃদ্ধির কথা বলিয়াছেন। তাহা হইলে মাল কত বড় মুছীবত। কারণ মাল বৃদ্ধি পাইলে অবাধ্যতা ও নাফরমানী আসিয়াই যায়। হযরত আলী (রাঃ) একদা একটি দেরহাম হাতে লইয়া বলিলেন, হে দেরহাম! তুইত এমন জিনিস যে, হাত হইতে না সরা পর্যন্ত কোন উপকারে আসিস না।

উম্মুল মুমিনীন হযরত যয়নাব বিনতে জাহাশ (রাঃ) -এর যুহদ

উম্মুল মুমিনীন হযরত যয়নাব বিনতে জাহাশ (রাঃ) -এর কাছে একবার হযরত উমর (রাঃ) কিছু টাকা পাঠাইলেন, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহা কিসের টাকা? উত্তরে বলা হইল ইহা আমীরুল মুমিনীন হযরত ওমর (রাঃ) আপনার কাছে হাদিয়া স্বরূপ পাঠাইয়াছেন। হযরত যয়নাব (রাঃ) বলিলেন আল্লাহ্ ওমর কে মাফ করুন। এই কথা বলিয়া একটি চাদর দুই টুকরা করিয়া একটি থলি তৈরি করিলেন এবং টাকাগুলি থলিতে ভরিলেন। অতঃপর সেই গুলি আত্মীয় স্বজন ও ইয়াতীমদের মধ্যে বন্টন করিয়া দেন। তারপর দুই হাত উঠাইয়া দোয়া করেন, হে আল্লাহ! পরবর্তী বৎসর যেন ওমরের দান আমার কাছে না আসে। বাস্তবে তাহাই হইল। সেই বৎসরই তিনি ইন্তিকাল করেন এবং নবী পত্মীদের মধ্যে সর্ব প্রথম তাহারই ইন্তিকাল হয়।

হাছান বসরী (রহঃ) বলেন, যে কেহ টাকা পয়সাকে সম্মান দিয়াছে আল্লাহ তাহাকে অপমানিত করিয়াছেন। বর্ণিত আছে, সর্ব প্রথম যখন দেরহাম দীনারের প্রচলন হয় তখন শয়তান ঐ দুইটি হাতে লইয়া চুম্বন করে এবং বলে, যে তোমাদিগকে ভালবাসিবে সে আমার প্রকৃত গোলাম। সুমাইত ইবনে আজলান বলেন, দেরহাম দীনার হইল মুনাফেকদের বাগডোর। ইহার মাধ্যমে তাহাদিগকে জাহান্নামের দিকে নিয়া যাওয়া হইবে।

টাকা পয়সা বিষধর বিচ্ছু

ইয়াইয়া ইবনে মুয়ায বলেন, টাকা পয়সা হইল বিচ্ছু। যদি বিচ্ছুর মন্ত্র ভালরূপে না জানা থাকে তবে উহা স্পর্শ করিওনা। কারণ সে যদি দংশন করে তবে উহার বিষ ক্রিয়ায় তুমি মারা যাইবে। জিজ্ঞাসা করা হইল, উহার মন্ত্র কি? উত্তরে বলিলেন, হালাল পন্থা গ্রহণ করা এবং যথাস্থানে খরচ করা। আলা ইবনে যিয়াদ (রহঃ) বলেন, দুনিয়া আমার সম্মুখে অত্যন্ত সাজিয়া গুজিয়া প্রকাশ পাইল। আমি তাহাকে দেখিয়া আল্লাহর কাছে পানাহ চাহিলাম। তখন সে বলিল, তুমি যদি ইহা চাও যে, আল্লাহ তোমাকে আমার ক্ষতি ও অপকার হইতে পানাহ দিন তাহা হইলে টাকা পয়সাকে অপছন্দ কর। টাকা পয়সাই দুনিয়া। কেননা টাকা পয়সার মাধ্যমেই মানুষ দুনিয়ার যাবতীয় জিনিষ লাভ করিয়া থাকে। অতএব যে ব্যক্তি টাকা পয়সার ব্যাপারে সংযমী হইতে পারিবে সে দুনিয়ার ব্যাপারেও সংযমী হইতে পারিবে। এই মর্মেই জনৈক কবি বলিয়াছেন-

"টাকা পয়সা হাতে আসিলেই তাকওয়ার যাচাই হয়, তোমার হাতে টাকা পয়সা আসার পর যদি উহা বর্জন কর তবে তুমি প্রকৃত মুসলমানের তাকওয়া অবলম্বন করিলে।"

অন্য এক কবি বলিয়াছেন-

"তাকওয়ার মাপকাঠি পোশাক পরিচ্ছদ বা কপালের দাগ নহে বরং তাকওয়ার মাপকাঠি হইল টাকা পয়সার ভালবাসা অথবা উহার প্রতি অনীহা" (অর্থাৎ টাকা পয়সার প্রতি যদি অনীহা থাকে তবে মনে করিতে হইবে যে সে মুত্তাকী নচেৎ খাটজামা বা খাটলুঙ্গি পরিলে অথবা নামায পড়িতে পড়িতে কপালে সেজদার দাগ পড়িয়া গেলেই প্রকৃত মুত্তাকী বলা যাইবেনা।)

অন্তিম শয্যায় হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আযীয (রহঃ) -এর বাণী

হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আযীয (রহঃ) -এর ইন্তিকালের সময় সালামা ইবনে আব্দুল মালিক তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, আমীরুল মুমিনীন। আপনি এমন একটি কাজ করিয়া গেলেন যাহা ইতিপূর্বে আর কেহ করে নাই। আপনি আপন সন্তান সন্তুতির জন্য কোন টাকা পয়সা রাখিয়া যান নাই। হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আযীয (রহঃ) -এর তেরজন সন্তান ছিল। তিনি বলিলেন, আমাকে বসাও। তাহাকে বসানো হইল অতঃপর বলিলেন, আমি তাহাদের জন্য কোন টাকা পয়সা রাখিয়া যাই নাই বলিয়া যে প্রশ্ন করিয়াছ উহার উত্তর শোন। আমি তাহাদের হক বিনষ্ট করি নাই আর অন্যের হক তাহাদিগকে দেই নাই। আমার সন্তান দুই রকম হইতে পারে। হয়তো আল্লাহর ফরমাবরদার ও অনুগত হইবে অথবা নাফরমান হইবে। যদি ফরমাবরদার হয় তবে আল্লাহই তাহাদের জন্য যথেষ্ট। কেননা আল্লাহ তায়ালা স্বয়ং ঘোষণা করিয়াছেন।

وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِيْنَ "আর তিনি নেককারদের তত্ত্বাবধান করেন। আর যদি নাফরমান হয় তবে আমার কোন পরোয়া নাই যাহা ইচ্ছা তাহা করিতে পারে।

মুহাম্মদ ইবনে কাব কুরাযী বহু সম্পদের অধিকারী হইলেন, তখন তাহাকে বলা হইল, আপনি যদি এই সমস্ত সম্পদ সন্তানদের জন্য রাখিয়া যাইতেন তাহা হইলে কতই না ভাল হইত। তিনি বলিলেন, আমি এই সম্পদ আল্লাহর জন্য সঞ্চয় করিতেছি আর আল্লাহকে আমার সন্তান সন্তুতির জন্য রাখিয়া যাইতেছি। জনৈক ব্যক্তি আবু আবদে রবকে বলিল, ভাই: এমন যেন না হয় যে, আপনি দুনিয়া হইতে মন্দ অবস্থায় চলিয়া গেলেন আর সন্তানের জন্য ধন-সম্পদ রাখিয়া গেলেন। তৎক্ষনাৎ আবু আবদে রব এক লক্ষ দেরহাম বাহির করিয়া সদকা করিয়া দিলেন।

মাল মৃত্যুকালীন মুসীবত

ইয়াহইয়া ইবনে মুয়ায (রহঃ) বলেন মৃত্যুর সময় মালের ব্যাপারে বান্দা এমন দুইটি মুসীবতের সম্মুখীন হয় যে এমন মুসীবতের কথা পূর্ববর্তীদের কেহই শুনে নাই। জিজ্ঞাসা করা হইল ঐ মুসীবত দুইটি কি? উত্তরে বলিলেন, একদিকে সমস্ত মাল তাহার নিকট হইতে ছিনাইয়া লওয়া হয় অপর দিকে সমস্ত মালের হিসাব দিতে হয়।

মালের প্রশংসা এবং প্রশংসা ও নিন্দার পরস্পরে সামঞ্জস্য বিধান

আল্লাহ তায়ালা কোরআনে কারীমের বিভিন্ন জায়গায় মাল কে খাইর বা কল্যান নামে অভিহিত করিয়াছেন। যেমন এক জায়গায় ইরশাদ করিয়াছেন-

إِنْ تَرَكَ خَيْرًا

"যদি খাইর (কল্যাণ) অর্থাৎ মাল রাখিয়া যায়।"

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলিয়াছেন, উত্তম মাল নেককার ব্যক্তির জন্য কতইনা ভাল। এতদ্ব্যতীত সদকা ও হজ্জের ছাওয়াব সম্পর্কিত যত আয়াত বা হাদীছ রহিয়াছে ঐ গুলিতে মালেরও প্রশংসা রহিয়াছে। কেননা মাল ব্যতিরেকে উক্ত আমলদ্বয় সম্ভব নহে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করিয়াছেন-

وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَ

"আর তাহারা আপন গুপ্তধন বাহির করিবে আপনার রবের অনুগ্রহে।"

আল্লাহ তায়ালা আরো ইরশাদ করিয়াছেন-

وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَّبَنِيْنَ وَيَجْعَلْ لَّكُمْ جَنّٰتٍ وَّيَجْعَلْ لَّكُمْ اَنْهَارًا

"আর তোমাদের মাল ও পুত্র বৃদ্ধি করিয়া দিবেন আর তোমাদের জন্য বহু বাগান ও বহু নহর সৃষ্টি করিয়া দিবেন।"

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলিয়াছেন "দারিদ্রতা- কুফরে লিপ্ত করিয়া দিতে পারে।" ইহাও মালেরই প্রশংসা। যেহেতু মাল সম্পর্কে প্রশংসা এবং নিন্দা উভয়টি বর্ণিত রহিয়াছে তাই উভয়টির মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করিতে হইবে, আর তজ্জন্য মালের হেকমত ও উদ্দেশ্য এবং সাথে সাথে উহার আপদ ও অপকারিতা সম্পর্কে জানিতে হইবে। ইহাতে সুস্পষ্ট হইয়া যাইবে যে, মাল এক হিসাবে ভাল আরেক হিসাবে মন্দ। ভাল হিসাবে প্রশংসনীয় মন্দ হিসাবে নিন্দনীয়। যেহেতু উহার মধ্যে দুইটি বিষয় রহিয়াছে তাই কখনও প্রশংসিত হইবে কখনও নিন্দিত হইবে। উল্লেখ্য যে প্রকৃত জ্ঞানীদের লক্ষ্য হইল আখেরাতের সৌভাগ্য ও সফলতা যাহা চিরস্থায়ী ও অফুরন্ত। জ্ঞানী ও বুযুর্গদের লক্ষ্য ইহাই থাকে। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) -এর কাছে জিজ্ঞাসা করা

হইয়াছিল, মানুষের মধ্যে সব চাইতে বুযুর্গ এবং জ্ঞানী কে ? উত্তরে বলিয়াছিলেন, "যে ব্যক্তি মৃত্যুকে অধিক স্মরণ করে এবং উহার জন্য বেশী প্রস্তুতি গ্রহণ করে।" উক্ত সৌভাগ্য ও সফলতা তিন প্রকার বিষয় ব্যতীত লাভ করা সম্ভব নহে। সেই গুলি হইতেছে -

(১) আত্মিক গুন, যথা- ইলম ও উত্তম চরিত্র।

(২) দৈহিক গুন, যথা- সুস্থতা ও সবলতা।

(৩) দেহ বহির্ভূত বিষয়। যথা- মাল ও অন্যান্য সামগ্রী।

এই তিনটির মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট হইল আত্মিক গুন তারপর দৈহিক গুন তারপর দেহবহির্ভূত বিষয় আর ইহাই সর্ব নিকৃষ্ট। তন্মধ্যেও সর্ব নিকৃষ্ট হইতেছে মাল অর্থাৎ টাকা পয়সা, কারণ টাকা পয়সাই সবার খেদমত ও সেবা করে, এবং অন্যের লক্ষ ও উদ্দেশ্য হইয়া থাকে তবে উহার সত্তা উদ্দেশ্য হয় না। কেননা নফস এমন এক উৎকৃষ্ট বিষয় যাহার সৌভাগ্য কাম্য এবং যাহা ইলম, মারেফাত ও উত্তম চরিত্রের খেদমত ও সেবা করে যাহাতে সেই গুলি সত্তাগত গুনে পরিনত হইয়া যায়। দেহ অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে নফসের খেদমত ও সেবা করে। আর খাদ্য বস্ত্র দেহের সেবা করে। আর পূর্বালোচনা দ্বারা জানা গিয়াছে যে, খাদ্য ও বস্ত্র দ্বারা উদ্দেশ্য দেহকে টিকাইয়া রাখা, বিবাহের উদ্দেশ্য বংশধর টিকাইয়া রাখা আর দেহের উদ্দেশ্য নফসকে পূর্ণত্বের শিখরে পৌছানো, উহাকে নির্মল করা অর্থাৎ আত্মশুদ্ধি, ইলম ও উন্নত চরিত্রের মাধ্যমে উহাকে সুসজ্জিত করা। যে ব্যক্তি উপরোক্ত আনুপূর্ব বুঝে সে মালের মর্যাদা উপলব্ধি করিতে পারিবে।

আর ইহাও বুঝিতে সক্ষম হইবে যে, ইহা যেহেতু অন্নবস্ত্রের জন্য প্রয়োজন আর অন্ন বস্ত্র দেহ টিকিয়া থাকার জন্য প্রয়োজন, আর দেহ নফস বা আত্মার পূর্ণতা লাভের জন্য প্রয়োজন যাহা উত্তম বিষয়, তাই মালও উত্তম বিষয়। আর যে ব্যক্তি কোন জিনিষের উপকারিতা এবং লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সমন্ধে অবগত থাকে অতঃপর উহা সেই লক্ষ্য হাসিলের জন্য প্রয়োগ করে তবে তাহার কাজ যথার্থ হয় এবং সে উপকৃত হয়। আর যে উদ্দেশ্য হাছিল হয় তাহাও প্রশংসানীয় হয়। অতএব মাল যেহেতু সঠিক উদ্দেশ্যে লাভের মাধ্যমও হইতে পারে আবার ভ্রান্ত উদ্দেশ্যের মাধ্যমও হইতে পারে তাই ইহা প্রশংসনীয় ও আবার নিন্দনীয়। প্রশংসনীয় উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য করত: প্রশংসনীয় আর নিন্দনীয় উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য করত: নিন্দনীয়। ভ্রান্ত উদ্দেশ্য হইতেছে ঐটি যাহা আখেরাতের সফলতা হইতে বিরত রাখে এবং ইলম ও আমলের পথ রুদ্ধ করিয়া দেয়। অতএব যে ব্যক্তির প্রয়োজন অতিরিক্ত মাল গ্রহণ করে হাদীছ অনুযায়ী সে যেন মৃত্যু গ্রহণ করিতেছে কিন্তু সে অনুভব করিতে পারিতেছেনা।

মানুষের স্বভাব ও প্রকৃতি যেহেতু শাহওয়াত বা প্রবৃত্তির প্রতি ধাবিত যাহা আল্লাহর পথকে রুদ্ধ করিয়া দেয় আর মাল হইল ঐ শাহওয়াত বা প্রবৃত্তি হাসিলের উপকরণ তাই প্রয়োজনাতিরিক্ত মাল গ্রহণের মধ্যে বিরাট আশংকা

রহিয়াছে। তাই আম্বিয়া (আঃ) মালের অপকারিতা হইতে পানাহ্ চাহিয়াছেন। এমনকি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দোয়া করিয়াছেন, হে আল্লাহ! মুহাম্মদের পরিবারবর্গের জন্যে জীবন ধারন পরিমান খাবারের ব্যবস্থা করিয়া দাও। লক্ষ্য করুন, তিনি দুনিয়া ততটুকুই কামনা করিয়াছেন যতটুকুর মধ্যে নিছক কল্যাণ রহিয়াছে। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আরো দোয়া করিয়াছেন, হে আল্লাহ! আমাকে মিসকিন হিসাবে জীবিত রাখুন, মিসকিন হিসাবে মৃত্যু দান করুন এবং হাশরের ময়দানে মিসকিনদের দলভুক্ত করিয়া উঠান। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) দোয়া করিয়াছেন-

وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ

"আর আমাকে এবং আমার ছেলেদিগকে মূর্তি পূজা হইতে দূরে রাখুন।" এই দোয়ায় তিনি সোনা রূপা অর্থাৎ টাকা পয়সার ভালবাসা হইতে পানাহ চাহিয়াছেন। কেননা পাথরকে মাবুদ ধারনা করা হইতে নবুয়্যতের মর্যাদা বহু উর্ধে। তিনিত নবুয়্যতের পূর্বে শৈশবেই ইহা হইতে পবিত্র ছিলেন। তাই এই ক্ষেত্রে ইবাদত দ্বারা সোনা রূপা অর্থাৎ টাকা পয়সার ভালবাসা এবং উহার প্রতি আকর্ষন কে বুঝানো হইয়াছে। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলিয়াছেন, ধ্বংস হউক দ্বীনারের গোলাম, ধ্বংস হউক দেরহামের গোলাম। তাহার পতন হউক উত্থান না হউক, কাঁটা ফুটিলে খুলিতে সক্ষম না হউক। উক্ত হাদীছ দ্বারা বুঝা গেল যে, যে ব্যক্তি দীনার দেরহামকে ভালবাসে সে উহাদের ইবাদতকারী। আর যে পাথরের ইবাদত করে সেই মূর্তি পূজক বরং যে কোন ব্যক্তি খাইরুল্লাহর পূজা করে সেই মূর্তি পূজক। অর্থাৎ যে বস্তু আল্লাহর ইবাদত ও তাঁহার হক আদায় হইতে বিরত রাখে সে যেন মূর্তি পূজক। আর ইহাই শিরক। তবে শিরক দুই প্রকার, শিরকে খফী বা অপ্রকাশ্য শিরক আর শিরকে জলী বা প্রকাশ্য শিরক। শিরকে খফী জাহান্নামের কারণ হয়না। তবে মুমেন হইতে ইহা খুব কমই পৃথক হয়। কেননা ইহা পিপীলিকার পদধ্বনির চাইতেও ক্ষীন। আর শিরকে জলী চির জাহান্নামের কারণ হয়। আল্লাহ তায়ালা আমাদিগকে সর্ব প্রকার শিরক হইতে পানাহ দিন।

মালের আপদ ও উপকারিতা

মাল হইল এমন সর্প সদৃশ্য যাহাতে বিষ ও রহিয়াছে আবার বিষ নাশক ঔষধও রহিয়াছে। মালের উপকারিতা হইল বিষ নাশক ঔষধ আর অপকারিতা হইল বিষ। যে ব্যক্তি মালের উপকারিতা অপকারিতা উভয়টি সম্পর্কে অবগত থাকে। সে উহার অপকারিতা হইতে বাঁচিতে পারে এবং উপকারিতা দ্বারা উপকৃত হইতে পারে।

মালের উপকারিতাসমূহ

মালের উপকারিতা দুই প্রকার। দুনিয়া সম্পর্কিত ও দ্বীন সম্পর্কিত। দুনিয়া

সম্পর্কিত উপকারিতা বর্ণনা করার প্রয়োজন মনে করিনা। কারণ সকলেরই জানা আছে। নচেৎ মানুষ ইহার জন্য এত কষ্ট করিতনা। আর দ্বীন সম্পর্কিত উপকারিতা তিন প্রকার। যথা-

এক ঃ মাল নিজের পিছনে খরচ করা সরাসরি ইবাদতের ক্ষেত্রে অথবা ইবাদতের ক্ষেত্রে সহায়ক হিসাবে। সরাসরি ইবাদতের ক্ষেত্রে যেমন- হজ্জ ও জিহাদে মাল খরচ করা। মাল ব্যতীত হজ্জ করা বা জিহাদ করা সম্ভব নহে। এই দুইটি ইবাদত প্রধান ইবাদতের অন্তর্ভূক্ত। দরিদ্র ও সম্পদহীন ব্যক্তি এই দুইটি ইবাদত হইতে বঞ্চিত থাকে। আর ইবাদতের ক্ষেত্রে সহায়ক যেমন অন্ন বস্ত্র বাসস্থান স্ত্রী ও অন্যান্য জীবনধারন সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় জিনিষ। কারণ এই সমস্ত জিনিষ লাভ না হইলে অন্তর এই গুলি হাসিলের চিন্তায় মগ্ন থাকিবে দ্বীনের জন্য অবসর হইতে পারিবে না। আর যে জিনিষ ব্যতীত ইবাদত সম্ভব নহে ঐ জিনিষ অর্জন করাও ইবাদত। অতএব দ্বীনি কাজের সহায়ক স্বরূপ প্রয়োজন পরিমাণ দুনিয়া গ্রহণ দ্বীনি উপকারিতারই অন্তর্ভূক্ত। তবে প্রয়োজনের অতিরিক্ত গ্রহণ বা বিলাসিতা ইহার অন্তর্ভূক্ত হইবেনা উহা দুনিয়াই গন্য হইবে।

দুইঃ যাহা মানুষের পিছনে খরচ করা হয়। ইহা আবার চারি প্রকার। সদকা, মানবতার তাগিদে খরচ, ইজ্জত আবরু রক্ষার উদ্দেশ্যে খরচ ও শ্রমিকের পারিশ্রমিক দান।

সদকার ছাওয়াব সুস্পষ্ট। কেননা ইহা আল্লাহ তায়ালার গযব ও গোস্বাকে নিবৃত করে। ইহার ফযীলত পূর্বে আলোচিত হইয়াছে।

মানবতার তাগিদে খরচ করা যেমন, ধনী ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগকে দাওয়াত করা, তাহাদিগকে হাদিয়া দান, তাহাদিগকে সাহায্য করা আরো ওই জাতীয় খরচ। ইহাকে সদকা বলা হইবে না। কেননা সদকা বলা হয় উহাকে যাহা অভাবগ্রস্ত ব্যক্তিকে দেওয়া হয়। তবে ইহার দ্বীনি স্বার্থ এইরূপ যে, ইহার মাধ্যমে দাতার বন্ধু বান্ধব বৃদ্ধি পাইবে, দানশীলতার গুন হাসিল হইবে এবং দানশীলদের অন্তর্ভূক্ত হইবে। কেননা ইহসান ও মানবতার আচরণ ছাড়া কোন ব্যক্তি দানবীর হইতে পারে না। আর এই জাতীয় খরচে বিরাট ছাওয়াবও রহিয়াছে। দারিদ্রের শর্ত ছাড়াও এমনিতে হাদিয়া দান ও দাওয়াত খাওয়ানোর ফযীলত সম্পর্কিত বহু হাদীছ রহিয়াছে।

ইজ্জত আবরু রক্ষার জন্য খরচ করা যেমন কবি বা নির্বোধ ব্যক্তিরা যাহাতে কুৎসা না রটায় সেই জন্যে তাহাদিগকে অর্থ প্রদান করা। ইহার উপকারিতা দুনিয়াতে লাভ হইয়া গেলেও ইহা দ্বীনি স্বার্থের মধ্যে গণ্য হইবে। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলিয়াছেন, কোন ব্যক্তি যদি আপন ইজ্জত আবরু রক্ষার্থে মাল খরচ করিয়া থাকে তবে উহাও তাহার আমল নামায় সদকা হিসাবে লেখা হইবে। আর ইহা সদকা হইবেইনা কেন, ইহার সাহায্যে গীবতকারীকে গীবত হইতে রক্ষা করা হইতেছে, এমনি ভাবে তাহার গীবতের

জবাবে শরীয়তের সীমা লঙ্ঘিত হয় এমন শত্রুতামূলক উক্তি উচ্চারণ করা হইতে বিরত থাকিতেছে।

আর শ্রমিকের পারিশ্রমিক দান দ্বীনিস্বার্থ এই হিসাবে যে, মানুষকে প্রয়োজনীয় সামগ্রী যোগারের জন্য বহু কাজ করিতে হয়। যদি এই সব কাজ একা আঞ্জাম দিতে যায় তবে তাহার সময় বিনষ্ট হইবে অধিকন্তু যিকির ফিকির তথা আখেরাতের কাজ দুরূহ হইয়া যাইবে। অথচ ইহাই হইতেছে সালেকের সবচাইতে বড় কাজ। আর যাহার কোন মাল নাই তাহার নিজের যাবতীয় খেদমত নিজেকেই করিতে হইবে। খাবার খরিদ করা, আটা পিষা, ঘর ঝাড় দেওয়া, কিতাব লিখা ইত্যাদি সমস্ত কাজ নিজেকেই আঞ্জাম দিতে হইবে। যে কাজ অন্যের মাধ্যমে করানো সম্ভব এমন কাজে আপনি স্বয়ং লিপ্ত হইলে ক্ষতিগ্রস্ত হইবেন। কেননা আপনার দায়িত্বে ইলম হাসিল, আল্লাহর স্মরণ ইত্যাদি এমন দ্বীনি কাজ রহিয়াছে যাহা অন্যের মাধ্যমে করানো সম্ভব নহে। অতএব যে ক্ষেত্রে আপনি মালদার হেতু অন্যের মাধ্যমে ঐ সমস্ত দুনিয়াবী কাজ সম্পাদন করাইতে পারিতেছেন সেই ক্ষেত্রে নিজে লিপ্ত হওয়া সময় বিনষ্ট করা ছাড়া বৈ আর কিছু নহে।

তিনঃ যাহা কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তির পিছনে খরচ করা হয় না কিন্তু ইহার দ্বারা ব্যাপক উপকার ও কল্যাণ সাধিত হয়। যেমন মসজিদ, পুল, সরাইখানা, হাসপাতাল, কূপ ইত্যাদি জনহিতকর কাজ। এই সমস্ত সৎ কাজের উপকারিতা মৃত্যুর পর লাভ হইতে থাকিবে। নেককার লোকেরা দাতার জন্য বহুকাল পর্যন্ত দোয়া করিতে থাকিবেন। ইহার চাইতে উত্তম আর কি হইতে পারে? এই সব কিছুই হইতেছে মালের দ্বীনি উপকারিতা। ইহা ছাড়া মালের বহু দুনিয়াবী উপকারিতাও রহিয়াছে। যেমন, দারিদ্রও ভিক্ষার লাঞ্ছনা হইতে রক্ষা পাওয়া, মানুষের কাছে মর্যাদাশীল হওয়া, অধিক বন্ধু বান্ধব সৃষ্টি হওয়া, মানুষের অন্তরে আজমত বৃদ্ধি পাওয়া।

মালের আপদ দ্বীনি দুনিয়াবী উভয়টি রহিয়াছে– দ্বীনি আপদ তিনটি

একঃ মালের অধিকারী হইলে গোনাহ করার সুযোগ হয়, যেহেতু শাহওয়াত তাহাকে উদ্বুদ্ধ করে। তবে ক্ষমতা না থাকার কারণে করে না। আর মানুষ যখন কোন গোনাহর ব্যাপারে নিরাশ হইয়া যায় তখন গোনাহর প্রতি উদ্বুদ্ধকারী শক্তিও দুর্বল হইয়া পড়ে। কিন্তু আবার যখন সক্ষম বলিয়া মনে হয় তখন পুনরায় সেই শক্তি মাথা চাড়া দিয়া উঠে। আর মালও একপ্রকার ক্ষমতা যাহা গোনাহর প্রতি উদ্বুদ্ধকারী শক্তিকে সতেজ ও সচেতন করে। এখন যদি খাহেশ অনুযায়ী উক্ত গোনায় লিপ্ত হইয়া পড়ে তবে ধ্বংস হইয়া যাইবে আর যদি সবর ও ধৈর্য ধারণ করে তবে কষ্টে পতিত হইবে। কারণ ক্ষমতা থাকা অবস্থায় ধৈর্য ধারণ করা বড়ই কঠিন। আর মাল ও স্বচ্ছলতার ফেতনা দারিদ্রের ফেতনার চাইতে বেশী বড়।

দুইঃ মালের কারণে বিলাসিতা বাড়িয়া যায়। কারণ মালদার ব্যক্তির জন্য ইহা কি সম্ভব যে, সে যবের রুটি খাইবে, মোটা কাপড় পড়িবে আর সুস্বাদু খাবার পরিত্যাগ করিবে যেমনি হযরত সুলায়মান (আঃ) রাজত্বের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও ভোগবিলাসীতা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন? অতঃপর ধীরে ধীরে এই বিলাসিতার সহিত তাহার ভালবাসা ও ঘনিষ্ঠতা সৃষ্টি হইয়া যাইবে যে, ইহা পরিত্যাগ করা মোটেই সম্ভব হইবে না। কখনও এমন হইবে যে, হালাল উপার্জনের মাধ্যমে বিলাসিতা সম্ভব হইবেনা তখন সন্দেহযুক্ত উপার্জনে লিপ্ত হইবে এবং দ্বীনের ব্যাপারে শিথিলতা, মিথ্যা, নেফাক প্রভৃতি নিম্ন চরিত্র ও অভ্যাস অবলম্বন করিবে যাহাতে দুনিয়ার কাজ কারবার ঠিক থাকে এবং বিলাসিতা বজায় রাখিতে পারে। অধিকন্তু মানুষের মাল যখন বৃদ্ধি পায় তখন মানুষের কাছে তাহার প্রয়োজনও বৃদ্ধি পাইয়া যায়; আর যখন মানুষের কাছে তাহার প্রয়োজন বৃদ্ধি পাইয়া যাইবে তখন তাহাদের সহিত অবশ্যই নেফাক মুলক আচরণ করিতে হইবে, কখনও তাহাদিগকে খুশী করার জন্য আল্লাহর নাফরমানী করিতে হইবে। অতএব কেহ যদি প্রথম আপদ অর্থাৎ বিলাসিতা হইতে মুক্ত থাকিতেও পারে কিন্তু এই সমস্ত আপদ হইতে মোটেই রক্ষা পাইবেনা। দ্বিতীয়তঃ মানুষের কাছে প্রয়োজন বাড়িয়া গেলে বন্ধুত্ব ও শত্রুতা সৃষ্টি হইবে। তখন হিংসা, রিয়া, কিবর, মিথ্যা, গীবত প্রভৃতি গোনাহর সৃষ্টি হইবে যেইগুলি যবান বা অন্তরের সহিত সম্পর্ক যুক্ত, ধীরে ধীরে এইগুলির প্রতিক্রিয়া অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পর্যন্ত পৌছিয়া যাইবে। এই সব ফেতনা ও আপদ মালের কারনেই।

তিনঃ ইহা এমন এক আপদ যাহা হইতে কেহই রক্ষা পায় না। সেইটি হইতেছে মালের সংরক্ষণ, আল্লাহর যিকির ও স্মরণ হইতে গাফেল করিয়া রাখে। আর যে জিনিষ আল্লাহর যিকির ও স্মরণ হইতে গাফেল করিয়া রাখে উহাতে ক্ষতি অনিবার্য। তাই হযরত ঈসা (আঃ) বলিয়াছেন মালে তিনটি আপদ রহিয়াছে। একটি হইল, অবৈধ পন্থায় উপার্জন করা। জিজ্ঞাসা করা হইল, যদি কেহ বৈধ পন্থায় উপার্জন করে? উত্তরে বলিলেন, যদি বৈধ পন্থায় উপার্জন করিয়াও থাকে তবে নাহক পথে খরচ করিবে। আবার জিজ্ঞাসা করা হইল, যদি হক পথে খরচ করে। উত্তরে বলিলেন, হক পথে খরচ করিলেও ইহার হেফাজত ও সংরক্ষন আল্লাহর যিকির হইতে গাফেল করিয়া রাখিবে। আর ইহা একটি দুরারোগ্য ব্যাধি। কেননা সমস্ত ইবাদতের সার হইতেছে আল্লাহর যিকির, তাঁহার স্মরণ ও তাহার কুদরত ও মহত্ত্বের ব্যাপারে ধ্যান করা। আর ইহার জন্য অন্তর সম্পূর্ণ অবসর ও ঝামেলামুক্ত থাকিতে হইবে। পক্ষান্তরে জমির মালিক সারাদিন কৃষক, শ্রমিক ও অংশীদারদের সহিত বিভিন্ন বিষয়ে ঝগড়ায় লিপ্ত থাকে, কখনও কাজ কর্মে ক্রুটি করার বিষয়ে, কখনও চুরি ও খেয়ানতের বিষয়ে, কখনও প্রতিবেশীর সহিত সীমানা সংক্রান্ত বিষয়ে, কখনও তহসীলদারের খাজনা সংক্রান্ত বিষয়ে তর্কবিতর্ক করিতেই থাকে। এমনিভাবে ব্যবসায়ী সর্বদা অংশীদার সম্পর্কে শংকিত থাকে যে, সে কাজে ক্রুটি করে কিনা, মুনাফা সম্পূর্ণটা

সে কুক্ষিগত করিয়া ফেলে কিনা বা মূলধন বিনষ্ট করিয়া ফেলে কিনা। পশুর মালিকেরও একই অবস্থা। অনুরূপ ভাবে সর্ব প্রকার মালদারই বিভিন্ন চিন্তায় ব্যস্ত থাকে। এই সমস্ত মালের মধ্যে তুলনামূলক চিন্তা কম থাকে মাটির নীচে রক্ষিত সম্পদের ক্ষেত্রে। কিন্তু সেখানেও চিন্তা রহিয়াছে, নাজানি কেহ জানিতে পারিয়া উহা উত্তোলন করিয়া লইয়া যায় বা কেহ লোভ করিয়া বসে। মোট কথা দুনিয়ার চিন্তার কোন অন্ত নাই। যাহার কাছে কেবল একদিনের খোরাক আছে সে-ই একমাত্র এই সব চিন্তামুক্ত। উল্লেখিত দুনিয়াবী আপদসমূহ ছাড়াও মালদারেরা হিংসাকারী ও পরশ্রীকাতরদিগকে দমন করার ব্যাপারে চিন্তা, ক্লেশ, মাল সংরক্ষণের চিন্তা ও কষ্ট ভোগ করিতেই থাকে। তাই মালের বিষ নাশক ঔষধ হইল প্রয়োজন পরিমাণ গ্রহণ করত; অবশিষ্ট মাল আল্লাহর রাস্তায় দান করিয়া দেওয়া। ইহা ছাড়া মাল আপদ এবং বিষ। আল্লাহ তায়ালা আমাদিগকে এই আপদ হইতে অনুগ্রহ করিয়া রক্ষা করুন। তিনি ইহাতে পূর্ণ সক্ষম।

লোভ লিপসার নিন্দা এবং কানাআত বা অল্পেতুষ্টি ও অন্যের মাল হইতে নিরাশ থাকার প্রশংসা

দারিদ্র নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। তবে দরিদ্র ব্যক্তির জন্য উচিৎ অল্পেতুষ্ট থাকা, অন্যের মালের প্রতি লোভ ও আশা না করা, যে কোন উপায়ে মাল উপার্জনের লিপসা না করা, ইহা তখনই সম্ভব যখন সে প্রয়োজন পরিমান অন্ন বস্ত্র ও বাসস্থানে তুষ্ট থাকিবে; একদিন বা বেশীর চাইতে বেশী এক মাসের সঞ্চয়ের চিন্তা করিবে। ইহার চাইতে বেশী পরিমান বা বেশী সময়ের চিন্তা করিলে সবর ও কানায়াত (অল্পেতুষ্টি) -এর সম্মান হইতে বঞ্চিত হইবে এবং লোভের লাঞ্ছনায় লাঞ্ছিত ও অপমানিত হইবে। আর লোভ মানুষকে মন্দ চরিত্র ও মানবতা বিরোধী কাজে লিপ্ত করে। বস্তুতঃ সৃষ্টিগত ভাবে মানুষের মধ্যে লোভ ও আশা রহিয়াছে। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলিয়াছেন, মানুষের যদি দুই মাঠ স্বর্ণ লাভ হয় তবে সে আরেক মাঠের আশা করিবে। মানুষের উদর মাটি ছাড়া অন্য কোন জিনিষ দ্বারা পূর্ণ হইবে না (১) আর যে তৌবা করে আল্লাহ তায়ালা তাহার তৌবা কবুল করেন।

আবু ওয়াকিদ লায়ছী (রাদিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) -এর প্রতি যখন কোন ওহী নাযিল হইত তখন আমরা তাঁহার কাছে, আসিতাম এবং তিনি আমাদিগকে সেই ওহী শুনাইয়া দিতেন। একদা তিনি বলিলেন, আল্লাহ তায়ালা বলেন, আমি মাল পাঠাইয়াছি এই জন্য যে, মানুষ নামায কায়েম করিবে, যাকাত প্রদান করিবে, মানুষের যদি এক মাঠ সোনা থাকে তবে সে দ্বিতীয় আরেক মাঠের আশা করিবে। যদি দুই মাঠ সোনা লাভ হইয়া যায় তবে তৃতীয় আরেক মাঠের আশা কবিবে। মানুষের উদর মাটি ছাড়া অন্য কোন জিনিষ দ্বারা পূর্ণ হইবে না। আর যে তৌবা করে আল্লাহ তায়ালা তাহার তৌবা কবুল করেন। হযরত আবু মূসা আশআরী (রাদিঃ) বলেন, সূরায়ে

টীকা-(১) অর্থাৎ মৃত্যুর পর মাটির নীচে চলিয়া গেলে তখন তাহার এই আশা শেষ হইবে।

বারাআতের মত এক সূরা নাযিল হইয়াছিল কিন্তু তাহা উঠাইয়া লওয়া হয়, তবে উহার একটি আয়াত স্মরণ করাইয়া দেওয়া হয়। সেইটি হইল,-

ان الله يؤيد هذا الدين باقوام الخ

"আল্লাহ তায়ালা এই দ্বীনের সাহায্য করিবেন এমন কতক সম্প্রদায়ের মাধ্যমে যাহাদের দ্বীনের মধ্যে[১] কোন হিস্যা নাই। মানুষের যদি দুই মাঠ মাল থাকে তবে সে তৃতীয় আরেক মাঠের আশা করিবে। মানুষের উদর একমাত্র মাটি দ্বারা পূর্ণ হইবে। আর যে ব্যক্তি তৌবা করে আল্লাহ তায়ালা তাহার তৌবা কবুল করেন।

লোভী দুই প্রকার

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, দুই প্রকার লোভী কখনও পরিতৃপ্তি লাভ করে না। ইলমের লোভী ও দুনিয়ার লোভী। অপর হাদীছে আছে, মানুষ বৃদ্ধ হয় কিন্তু তাহার দুইটি জিনিষ যৌবন লাভ করে। একটি হইল আশা অপরটি হইল মালের প্রতি ভালবাসা।

মালের তুষ্টির প্রশংসা

যেহেতু মালের ভালবাসা মানুষের সৃষ্টিগত ও প্রকৃতিগত বিষয় এবং ইহা মানুষের জন্য ধ্বংসকর তাই আল্লাহ এবং তাঁহার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অল্পে তুষ্টির প্রশংসা করিয়াছেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলিয়াছেন ঐ ব্যক্তি সৌভাগ্যবান যে ইসলামের প্রতি হেদায়াত প্রাপ্ত হইয়াছে আর প্রয়োজন পরিমান জীবিকা লাভ করিয়াছে অতঃপর সে উহার প্রতি তুষ্ট হইয়াছে। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আরো বলেন, কেয়ামতের দিন প্রত্যেক ধনী দরিদ্র এই অবস্থা করিবে, হায়, আমাকে যদি দুনিয়াতে কেবল জীবন ধারন করার মত প্রয়োজন পরিমান মাল দেওয়া হইত। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলিয়াছেন, বেশী সম্পদের অধিকারী হওয়ার নাম ধনী নহে প্রকৃত ধনী হইল ঐ ব্যক্তি যাহার মন ধনী। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) অতি লোভ ও অতি সঞ্চয় প্রয়াস করিতে নিষেধ করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন, তোমরা মাল অন্বেষণের ক্ষেত্রে সংযম সরল পন্থা অবলম্বন কর। কেননা বান্দা তাহাই পাইবে যাহা আল্লাহ তায়ালা তাহার জন্য লিখিয়া রাখিয়াছেন। আর বান্দার জন্য যাহা লিখা আছে উহা ভোগ না করিয়া বান্দা দুনিয়া হইতে যাইতে পারিবে না।

বর্ণিত আছে হযরত মুসা (আঃ) একদা আল্লাহর নিকট জিজ্ঞসা করিলেন, আপনার বান্দাদের মধ্যে সবচাইতে ধনী কে? আল্লাহ তায়ালা উত্তরে বলিলেন, ঐ বান্দা যে আমার প্রদত্ত জিনিসে সবচাইতে বেশী তুষ্ট। হযরত মূসা (আঃ) আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, সর্বাপেক্ষা ইনসাফগার ব্যক্তি কে? আল্লাহ তায়ালা উত্তরে বলিলেন, যে আপন নফসের প্রতি বেশী ইনসাফগার।

হযরত ইবনে মাসউদ (রাদিঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি

টীকা- (১) অর্থাৎ অমুসলমানদের দ্বারা

ওয়াসাল্লাম) বলিয়াছেন, জিব্রাঈল (আঃ) আমার অন্তরে এই বিষয়ের উদয় ঘটাইয়াছেন যে, কোন ব্যক্তি তাহার রিযিক পরিপূর্ণ ভোগ করার পূর্বে মৃত্যু বরণ করিবেনা। অতএব তোমরা রিযিক অন্বেষণে সংযম অবলম্বন কর। আবু হুরাইরা (রাদিঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাকে বলিলেন, তোমার যখন অত্যন্ত ক্ষুধা অনুভব হয় তখন একটি রুটি ও এক পেয়ালা পানিতে যথেষ্ট বোধ কর আর দুনিয়াকে পদাঘাত কর। হযরত আবু হুরাইরা (রাদিঃ) আরো বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলিয়াছেন, তুমি তাকওয়া ও সংযম অবলম্বন কর সবচাইতে বড় আবেদ হইয়া যাইবে, অল্পেতুষ্ট হইয়া যাও সবচাইতে বড় শোকরগুজার হইয়া যাইবে। আর নিজের জন্য যাহা পছন্দ কর অন্যের জন্য তাহা পছন্দ কর প্রকৃত মুমেন হইয়া যাইবে। আর লিপসার নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কে আবু আইয়ুব আনসারী (রাদিঃ)হইতে বর্ণিত আছে।

জনৈক আরব বেদুঈনের প্রতি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) -এর উপদেশ

জনৈক বেদুঈন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) -এর নিকট আসিয়া বলিল ইয়া রাসূলুল্লাহ। আমাকে কিছু উপদেশ দিন এবং সংক্ষেপে বলুন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলিলেন তুমি নামায এমন ভাবে পড় যেন ইহা তোমার সর্ব শেষ নামায। এমন কথা কখনও বলিওনা যাহার দরুন ওযর করিতে হয়, আর অন্যের মাল হইতে নিরাশ হইয়া যাও অর্থাৎ অপরের মালের প্রতি লোভ করিওনা।

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) -এর কাছে কাহারও নিকট কিছু না চাওয়ার বাইয়াত

আউফ ইবনে মালেক আশজায়ী (রাদিঃ) বর্ণনা করেন, আমরা নয় জন অথবা আট জন অথবা সাত জন লোক রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) -এর খেদমতে উপস্থিত ছিলাম। তিনি আমাদিগকে বলিলেন, তোমরা আল্লাহর রাসূলের নিকট বয়াত করিবে না কি? আমরা বলিলাম ইয়া রাসূলুল্লাহ আমরা তো বাইয়াত করিয়াছি। তিনি আবার বলিলেন, তোমরা আল্লাহ রাসূলের নিকট বাইয়াত করিবে না কি? তখন আমরা হাত প্রশস্ত করিয়া দিলাম। আমাদের মধ্য হইতে এক ব্যক্তি বলিল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমরা তো আপনার নিকট বাইয়াত করিয়াছি এখন কিসের উপর বাইয়াত করিব? রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলিলেন, তোমরা বাইয়াত ও অঙ্গীকার কর যে, একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করিবে, অন্যকোন বস্তুকে তাহার সহিত শরীক করিবেনা, পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়িবে, আমীরের আনুগত্য করিবে। ইহার পর নিম্নস্বরে একটি কথা বলিলেন, কাহারো কাছে কিছু চাহিবে না। বর্ণনা কারী বলেন, পরে দেখা গিয়াছে, ঐ সমস্ত লোকের কোন একজনের একটি চাবুক হাত হইতে পড়িয়া গেলেও উহা উঠাইয়া দেওয়ার জন্য কাহাকেও বলিতেন না।

লোভ আর আশাই প্রকৃত দারিদ্র

হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাদিঃ) বলিয়াছেন, লোভ ও আশা হইল দারিদ্র, আর নিরাশা হইল ধনবত্তা, কোন ব্যক্তি যখন মানুষের হাতে যে সম্পদ আছে উহা হইতে নিরাশ হইয়া যায় তখন সে অপ্রত্যাশী হইয়া যায়। জনৈক বিজ্ঞ ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল, ধনবত্তা কাহাকে বলে? উত্তরে বলিলেন, আশা কম করা এবং প্রয়োজন মিটে পরিমান সম্পদে তুষ্ট থাকা। এই মর্মে জনৈক কবি বলিয়াছেন-

"জীবন হইল কিছু কালের নাম যাহা অতিবাহিত হইয়া যায়, আর কিছু বিপদাপদের নাম যাহা বারবার আসিবে। অতএব তুমি যাহা আছে উহার প্রতি তুষ্ট হইয়া যাও তবে সুখী থাকিবে আর খাহেশ ও প্রবৃত্তির অনুগত্য বর্জন কর স্বাধীন জীবন যাপন করিবে। অনেক মৃত্যু এমন যাহার কারণ হয় সোনা রূপা ও মনিমুক্তা।"

মুহাম্মদ ইবনে ওয়াসে (রহঃ) -এর বর্ণনা কানাযাত বা অল্পে তুষ্টি

মুহাম্মদ ইবনে ওয়াসে শুকনা রুটি পানি দ্বারা সিক্ত করিয়া খাইতেন আর বলিতেন, যে ব্যক্তি ইহাতে তুষ্ট থাকিবে সে কাহারো প্রতি মুখাপেক্ষী হইবে না। সুফিয়ান ছাওরী (রহঃ) বলেন, দুনিয়ার সর্বোত্তম বস্তু উহা যাহাতে তোমরা আক্রান্ত হও নাই আর যাহাতে আক্রান্ত হইয়াছ উহার মধ্যে সর্বোত্তম বস্তু উহা যাহা তোমাদের হাত হইতে বাহির হইয়া গিয়াছে।

কানাআতের ব্যাপারে দৈনিক ফেরেশতার ঘোষণা

হযরত ইবনে মাসউদ (রাদিঃ) বলেন, প্রতি দিন এক ফেরেশতা ঘোষণা দেয়, হে আদম সন্তান। যে অল্প মালে তোমার প্রয়োজন মিটিয়া যায় উহা ঐ অধিক মাল হইতে উত্তম যাহা তোমাকে নাফরমানীতে লিপ্ত করে।

সুমাইত ইবনে আজলানের কানাআত

সুমাইত ইবনে আজলান (রহঃ) বলেন, হে আদম সন্তান। তোমার উদরটা তো মাত্র অর্ধ বর্গহাত। তারপরও কেন সে তোমাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করে? জনৈক বিজ্ঞ ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল, আপনার সম্পদ কি? তিনি উত্তরে বলিয়াছিলেন, বাহ্যিক ভাবে সুসজ্জিত থাকা অভ্যন্তরীন ভাবে মিতব্যায়িতা ও মিতাচার অবলম্বন করা আর মানুষের সম্পদ হইতে নিরাশ থাকা। বর্ণিত আছে, আল্লাহ তায়ালা বলেন, হে আদম সন্তান। সমগ্র দুনিয়াও যদি তোমার হইয়া যায় তবু তুমি খাদ্য ছাড়া আর কিছুই পাইতেছনা। অতএব আমি যদি তোমাকে কেবল খাদ্য দান করি আর দুনিয়ার হিসাব অন্যের কাঁধে চাপাইয়া দেই তবে ইহা তোমার প্রতি বিরাট অনুগ্রহ হইবে। ইবনে মাসউদ (রাদিঃ) বলেন, কেহ যদি অন্য কাহারো কাছে কোন কিছু চায় তবে যেন খুব সাদাসিধা ভাবে চায়, তাহার কাছে যেন অহেতুক প্রশংসা করিয়া তাহাকে ধ্বংস করিয়া না দেয়। কারণ যাহা

তাহার তকদীরে লেখা আছে তাহাই সে পাইবে। সুতরাং অনর্থক কষ্ট করার কোন প্রয়োজন নাই। বনি উমাইয়ার খলীফাদের মধ্য হইতে কোন এক খলীফা আবু হাযেম (রহঃ) এর নিকট লিখিয়া পাঠিয়াছিলেন, আপনার সমস্ত প্রয়োজন আমার কাছে জানাইবেন। আবু হাযেম (রহঃ) উত্তরে লিখিলেন, আমার সমস্ত প্রয়োজন আপন মাওলার কাছে পেশ করিয়াছি। তন্মধ্যে যে পরিমান তিনি মঞ্জুর করিয়াছেন উহা আমি কবুল করিয়াছি আর যাহা না মঞ্জুর করিয়াছেন উহার ব্যাপারে আমি সবর করিয়াছি।

সবচাইতে খুশীর কারণ কোনটি ও সবচাইতে দুঃখী কে

জনৈক বিজ্ঞ ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল, জ্ঞানীর জন্য কোন জিনিষ সব চাইতে বেশী খুশির কারণ আর কোন জিনিষ চিন্তা দূরীভূত হওয়ার ক্ষেত্রে সব চাইতে বেশী সহায়ক? তিনি উত্তরে বলিয়াছিলেন, সবচাইতে খুশির কারণ হইল নেক আমল যাহা সে করে আর চিন্তা দূরীভূত হওয়ার ক্ষেত্রে সব চাইতে বেশী সহায়ক হইল তকদীরের প্রতি সন্তুষ্ট থাকা। জনৈক বিজ্ঞ ব্যক্তি বলেন, সবচাইতে বেশী চিন্তাযুক্ত পাইয়াছি পরশ্রী কাতরকে আর সবচাইতে সুখী জীবন যাপনকারী পাইয়াছি অল্পেতুষ্ট ব্যক্তিকে, সব চাইতে বেশী কষ্ট সহ্যকারী পাইয়াছি লোভীকে, সব চাইতে সহজ জীবন যাপনকারী পাইয়াছি দুনিয়া বিরাগীকে আর সবচাইতে লজ্জিত পাইয়াছি অন্যায়ে লিপ্ত আলেমকে। এই মর্মে জনৈক ব্যক্তি বলিয়াছেন,

ঐ ব্যক্তি অত্যন্ত আরামদায়ক জীবন যাপন করিতেছে, যাহার বিশ্বাস আছে যে, যিনি রিযিক বণ্টন করিয়াছেন তিনিই তাহাকে রিযিক দান করিবেন। এমন ব্যক্তির ইজ্জত আবরু ও বিনষ্ট হইবে না চেহারাও মলিন হইবেনা, যে ব্যক্তি অল্পে তুষ্টির আঙ্গিনায় পদার্পন করিয়াছে সে জীবনে কখনও বিরক্তকর ও অসন্তোষজনক বিষয় দেখিবেনা"। অপর এক ব্যক্তি বলিয়াছেন,

আমি আর কত দিন আসা যাওয়া করিব, দীর্ঘ প্রচেষ্টা কতদিন চলিবে, এদিক ওদিক আর কতদিন ঘুরা ফেরা করিব। আমি মাতৃভূমি ত্যাগ করিয়া আর কতদিন প্রবাসী থাকিব? আমার বন্ধুবান্ধবও আপনজনেরা জানেনা যে আমার কি অবস্থা। কখনও পৃথিবীর পূর্ব প্রান্তে কখনও পশ্চিম প্রান্তে, লিপ্সার কারণে মৃত্যুর চিন্তা কখনও আমার মনে আসেনা। আমি যদি অল্পেতুষ্ট হইতাম এবং সবর করিতাম তবে রিযিক আমার কাছে আমার ঘরেই আসিত। বস্তুতঃ ধনী অল্পেতুষ্ট ব্যক্তিকে বলে অধিক মালের অধিকারীকে নহে।

হযরত ওমর (রাদিঃ) -এর কানাআত

হযরত ওমর (রাঃ) একদা বলিলেন আল্লাহর মালে আমি কি পরিমান নিজের জন্য হালাল মনে করি তোমাদিগকে বলিয়া দিতেছি। দুই জোড়া কাপড় শীত গ্রীষ্মের জন্য, হজ্জ ও ওমরার জন্য যথেষ্ট হয় এমন সাওয়ারী, আর আমার

খাদ্য একজন কুরাইশী ব্যক্তির খাদ্যের ন্যায়। অতি উৎকৃষ্ট মানেরও নহে অতি নিম্মমানেরও নহে। আল্লাহর কসম, জানিনা ইহা আমার জন্য হালাল কিনা। হযরত ওমর (রাদিঃ) যেন এত টুকুর ব্যাপারে সন্দিহান যে, ইহা প্রয়োজনের অতিরিক্ত হইয়া গিয়াছে কিনা। জনৈক আরব বেদুঈন ভৎসর্না স্বরূপ আপন লোভী ভাইকে বলিল– ভাই! তুমি এক জিনিসকে তালাশ করিতেছ আর তোমাকেও এক জিনিসে তালাশ করিতেছে। (অর্থাৎ মৃত্যু) তোমাকে যে জিনিসে তালাশ করিতেছে উহা হইতে পালানোর কোন উপায় নাই। আর তুমি যে জিনিস (অর্থাৎ রিযিক) তালাশ করিতেছ উহা তোমার নিকট নিঃসন্দেহে পৌঁছিবে। যে জিনিস মৃত্যু তোমার চক্ষুর অন্তরালে গুপ্ত, তাহা তোমার নিকট এখন আর গুপ্ত নয় বরং প্রকাশ্য। তুমি বর্তমানে যে অবস্থায় আছ তাহার পরিবর্তন হইবে, হে ভাই! তুমি মনে করিয়াছ যে, লোভী ব্যক্তির অন্তর কখনো নিরাশ হয় না এবং সংসার ত্যাগী ব্যক্তি কখনো রিযিক পায় না। ইহা তোমার কল্পনা মাত্র। এই মর্মে কেহ বলিয়াছেন-

"আমি তোমাকে দেখিতেছি, সম্পদের প্রাচুর্য দুনিয়ার প্রতি তোমাকে এতই অনুরাগী ও লিপসু করিয়াছে যে, মনে হয় যেন তুমি মরিবেনা। ইহার কোন শেষ আছে কি? তুমি যদি এক দিন বলিতে, যাহা আছে তাহাই যথেষ্ট তবে তুমি তুষ্ট হইয়া যাইতে।"

জনৈক শিকারীর ঘটনা

শাবী (রহঃ) বর্ণনা করেন, জনৈক শিকারী একদা একটি পাখি শিকার করিল। পাখিটি তাহাকে বলিল, তুমি আমাকে দিয়া কি করিবে? সে বলিল, জবেহ করিয়া খাইব। পাখি বলিল, আল্লাহর কসম, আমাকে খাইলে তোমার ক্ষুধা নিবারন হইবেনা। তবে আমি তোমাকে তিনটি বিষয় শিখাইব। তন্মধ্যে একটি এখনই বলিয়া দিব, দ্বিতীয়টি গাছের উপরে বসিয়া বলিব আর তৃতীয়টি পাহাড়ের উপর যাইয়া বলিব। শিকারী বলিল, প্রথমটি বল, পাখি বলিল, হারানো বস্তুর জন্য কখনও আফসোস করিওনা। এই কথা বলার পর শিকারী পাখিটি ছড়িয়া দিল। পাখি গাছের ডালায় যাইয়া বসিল, শিকারী বলিল, এখন দ্বিতীয়টি বল। পাখি বলিল, যে বিষয় হইতে পারে না উহা কখনও বিশ্বাস করিওনা। অতঃপর সে পাহাড়ে যাইয়া বসিল এবং শিকারীকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, তুমি অত্যন্ত হতভাগা। যদি তুমি আমাকে জবেহ করিতে তবে আমার পেট হইতে দুইটি মোতি বাহির হইত প্রত্যেকটি মোতির ওজন বিশ মিসকাল।(১) শিকারী ইহা শুনিয়া ঠোঁট কামড়াইয়া বলিল, তৃতীয়টি বল, পাখি বলিল, তুমি তো প্রথম দুইটিই ভুলিয়া গিয়াছ তৃতীয়টি কিভাবে বলিব? আমি তোমাকে প্রথমে বলি নাই যে, হারানো বস্তুর জন্য আফসোস করিবেনা এবং যে বিষয় হইতে পারেনা উহা বিশ্বাস করিওনা, আমার গোশত, হাড়, পাখা ইত্যাদি সব কিছু মিলিয়াও বিশ মিসকাল হইবেনা তাহা হইলে আমার পেটের ভিতর এমন দুইটি মোতি কি

টীকা (১) মিসকাল সাড়ে চার মাশা পরিমান।

করিয়া থাকিতে পারে যে, প্রত্যেকটির ওজন বিশ মিসকাল হইবে? এই কথা বলিয়া পাখিটি উড়িয়া চলিয়া গেল। ইহা হইল মানুষের অতি লোভের দুষ্টান্ত। অতি লোভ মানুষকে অন্ধ করিয়া ফেলে। অতএব সে হক বিষয়ও বুঝিতে পারেনা। তখন যাহা হইতে পারে না এমন বিষয়কেও বিদ্যমান বলিয়া মনে করে।

ইবনে শিমাক (রহঃ) বলেন, আশা তোমার অন্তরের রশি এবং পায়ের বেড়ি। তুমি অন্তরের রশি বাহির করিয়া ফেল, পায়ের বেড়ি খুলিয়া পড়িবে। আবু মুহাম্মদ ইয়াযিদী (রহঃ) বলেন, একদা আমি হারুনুর রশীদের কাছে গিয়া দেখিলাম, একটি কাগজে স্বর্ণাক্ষরে লেখা দুইটি চরণ গভীর মনোযোগের সহিত দেখিতেছেন। আমাকে দেখিয়া মৃদু হাসি দিয়া বলিলেন, চরণ দুইটি বনি উমাইয়ার ধনাগারে পাওয়া গিয়াছে। আমার কাছে খুবই ভাল লাগিল তাই আমি এই দুইটির সহিত আরো একটি সংযোজন করিয়া দিলাম ---কবিতার চরণ-

انا سد باب عنك من دون حاجة × فدعه لاخرى ينفتح لك بابها

فان قراب البطن يكفيك ملؤ × ويكفيك سوءات الامور اجتنابها

ولاتك مبذالا لعرضك واجتنب × ركوب المعاصى يجتنبك عقابها

অনুবাদ- তোমার কোন এক প্রয়োজন যদি পূর্ণ না হয় তবে আরেকটি পূর্ণ হইবে। চিন্তার কোন কারণ নাই। পেট তো ভরিতে পারিলেই চলে। কিন্তু কোন

খারাপ বিষয় হইতে রক্ষা পাইতে হইলে উহা বর্জন করিতে হইবে। (সংযোজিত চরণ)

অতএব তুমি আপন ইজ্জত আবরু কে বিনষ্ট করিওনা, আর তুমি গোনাহে লিপ্ত হইও না উহার শাস্তি হইতে বাঁচিয়া থাকিবে।

আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম (রাদিঃ) কাব আহবার (রাদিঃ)-কে জিজ্ঞাসা করিলেন, ইলম বুঝার এবং শিখার পর কোন জিনিষে ইলমকে অন্তর হইতে বাহির করিয়া দেয়? কাব (রাদিঃ) উত্তরে বলিলেন, লোভ ও মনের চাহিদা আর উদ্দেশ্য হাসিলের স্পৃহা। জনৈক ব্যক্তি ফুযাইল (রহঃ)-কে কাব (রাদিঃ) -এর উক্তির ব্যাখ্যা জিজ্ঞাসা করিলেন। ফুযাইল (রহঃ) বলিলেন, এক ব্যক্তি কোন একটি জিনিষের লোভ করতঃ উহার পিছনে পড়িয়া দ্বীনকে বরবাদ করিয়া দেয়। আর মনের চাহিদা হইল, মন চায় যেন সমস্ত আশাই পূর্ণ হইয়া যায়। অতএব এই ধ্যানে বিভিন্ন মানুষের দ্বারে ঘুরিতে থাকে। যখন সে তোমার মনোরথ পূর্ণ করিয়া দিবে তখন সে তোমাকে যেখানে ইচ্ছা সেখানে লইয়া যাইবে তুমি তাহার বাধ্যগত ও অনুগত হইয়া যাইবে। দুনিয়ার স্বার্থে তাহাকে সালাম করিবে, অসুস্থ হইলে সেবা করিবে। আল্লাহর সন্তুটির উদ্দেশ্যে করিবেনা। যদি তাহার দ্বারা তোমার দুনিয়াবী উদ্দেশ্য হাসিল না হইত তবেই ভাল ছিল। অতঃপর ফুযাইল বলিলেন, এই উপদেশ তোমার জন্য সহস্র হাদীছ হইতে উত্তম।

কোন বিজ্ঞ ব্যক্তি বলেন, মানুষের মধ্যে বড়ই আশ্চর্যের বিষয় হইল ইহা যে, যদি ঘোষণা দেওয়া হয় যে, তুমি চিরকাল বাঁচিবে তবে যে পরিমান লোভ ও আশা তাহার হইত উহার চাইতে অনেক বেশী লোভ এখন, অথচ এই জীবন সামান্য কয়েকদিনের মাত্র পরিশেষে নিঃশেষ হইয়া যাওয়ার বিশ্বাস রহিয়াছে। আব্দুল ওয়াহিদ ইবনে যায়েদ (রহঃ) বর্ণনা করেন, একদা জনৈক রাহেবের সহিত আমার সাক্ষাৎ হইল। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনার খাবার কোথা হইতে আসে? উত্তরে বলিল, ঐ সত্তার আঙ্গিনা হইতে যিনি এই চাকা অর্থাৎ দাত সৃষ্টি করিয়াছেন। পিষা অবস্থায় আমার কাছে আসিয়া পৌঁছে।

লোভ লিপ্সার চিকিৎসা এবং সবর ও অল্পেতুষ্টি লাভের পন্থা

এই ঔষধ তিনটি উপাদানের তৈরি। সবর, ইলম ও আমল। আর এই গুলির সমষ্টি হইল পাঁচটি বিষয়। যথা-

একঃ আমল। অর্থাৎ মিতব্যয়, কেহ যদি অল্পেতুষ্টির মর্যাদা লাভ করিতে চায় তাহার উচিৎ যথাসম্ভব খরচের দ্বার বন্ধ করা এবং কেবল প্রয়োজনীয় খরচ করিয়া খাওয়া, খরচের দ্বার প্রশস্ত করিলে, অল্পেতুষ্টি সম্ভব নহে। যদি একা থাকে তবে একটি মোটা কাপড় এবং যে কোন খাবারে যথেষ্টবোধ করা চাই। তরকারি যথাসম্ভব কম খাওয়া চাই। ইহার উপর নফসকে অভ্যস্ত করা চাই। আর যদি পরিবারে আরো লোক থাকে তবে প্রত্যেকের জন্য উল্লেখিত পরিমানে ব্যবস্থা করা চাই। কেননা এই পরিমান খুব কম কষ্টেই যোগাড় করা যায় এবং মিতব্যয় ও মধ্যপন্থা অবলম্বন করা যায়। আর ইহাই সহজ জীবন যাপন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলিয়াছেন- আল্লাহ তায়ালা প্রত্যেক বিষয়ে সহজ বিধান পছন্দ করেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আরো বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি মিতব্যয়িতা অবলম্বন করে সে গরীব হয়না। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলিয়াছেন, তিনটি জিনিষ মুক্তি দানকারী।

(১) প্রকাশ্যে অপ্রকাশ্যে আল্লাহকে ভয় করা।

(২) দারিদ্র ও স্বচ্ছলতা উভয় অবস্থায় মিতব্যয়িতা অবলম্বন করা।

(৩) খুশি ও গোস্বা উভয় অবস্থায় ন্যায় বিচার করা।

বর্ণিত আছে, জনৈক ব্যক্তি হযরত আবু দারদা (রাদিঃ)-কে মাটি হইতে একটি দানা উঠাইতে দেখিলেন এবং বলিতে শুনিলেন, বুদ্ধিমত্তার পরিচয় হইল জীবিকা নির্বাহের ক্ষেত্রে সহজ বিধান অবলম্বন করা।

মিতব্যয় সচ্চরিত্র ও সদাচার নবুয়্যতের অংশ বিশেষ

ইবনে আব্বাস (রাদিঃ) হইতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলিয়াছেন, মিতব্যয়, সচ্চরিত্র ও সদাচার নবুয়্যতের বিশাধিক অংশের অংশ বিশেষ। হাদীছে আছে, প্রচেষ্টা অর্ধেক জীবিকা। রাসূলুল্লাহ

(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি মিতব্যয়িতা অবলম্বন করে আল্লাহ তায়ালা তাহাকে ধনী করিয়াছেন, যে ব্যক্তি অপব্যয় করে আল্লাহ তায়ালা তাহাকে দরিদ্র করিয়া দেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহকে স্মরণ করে আল্লাহ তাকে ভালবাসেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলিয়াছেন, তুমি কোন কাজ করিবার ইচ্ছা করিলে ধীরস্থিরতা অবলম্বন করিবে আল্লাহ তায়ালা সুব্যবস্থা করিয়া দিবেন। খরচের ব্যাপারে ধীরস্থিরতা অবলম্বন করা বুঝিয়া শুনিয়া খরচ করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

দুইঃ বর্তমানে প্রয়োজন মিটে পরিমান মাল লাভ হইয়া গেলে ভবিষ্যতের জন্য ব্যস্ত ও চিন্তিত না হওয়া চাই। এই ব্যাপারে সহায়ক হইল আশা খাট করা এবং এই ধ্যান করা যে, লোভ না করিলেও যাহা তাকদীরে আছে তাহা লাভ হইবেই। কেননা লোভ রিযিক লাভের কারণ নহে। বরং আল্লাহ তায়ালার ওয়াদার প্রতি বিশ্বাসী ও নির্ভরশীল হওয়া চাই। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করিয়াছেন -

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِى الْاَرْضِ اِلاَّ عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا -

"ধরা পৃষ্ঠে বিচরণকারী প্রতিটি প্রাণীর রিযিক আল্লাহর যিম্মায়।"

শয়তান মানুষকে দরিদ্র ও মন্দকাজের প্রতিশ্রুতি দেয়।সে বলে, তুমি যদি মাল সঞ্চয় না কর তবে কখনও হয়ত অসুস্থ হইয়া পড়িবে অথবা উপার্জনাক্ষম হইয়া পড়িবে তখন ভিক্ষার লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইবে। অতএব সারা জীবন তাহাকে দারিদ্রের ভয় যোগাইয়া কষ্ট ও মেহনত করাইতে থাকে, আর সে তাহার এই অবস্থা দেখিয়া হাসিতে থাকে যে, ভবিষ্যৎ অসুবিধার সম্ভাবনায় সে কিভাবে বর্তমানে মেহনত ও কষ্ট করিতেছে আর আল্লাহর স্মরণ হইতে গাফেল থাকিয়া যাইতেছে। ভবিষ্যতে অসুবিধা নাও হইতে পারে। এই মর্মে জনৈক ব্যক্তি বলিয়াছেন– "*যে ব্যক্তি দারিদ্রের আশংকায় মাল সঞ্চয়ে সময় ব্যয় করে তাহার এই কাজটিই দারিদ্র।*"

একদা হযরত খালেদ ইবনে ওলীদের দুই পুত্র রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) -এর খেদমতে আগমন করিলেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, যতক্ষণ তোমাদের মাথা নড়া চড়া করে অর্থাৎ বাঁচিয়া থাক রিযিকের চিন্তা করিওনা। দেখ, মায়ের গর্ভ হইতে সন্তান ভুমিষ্ট হয় তখন তাহার গায়ে কিছুই থাকে না। তখনও আল্লাহ তায়ালা তাহাকে রিযিকদান করেন। একদা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হযরত ইবনে মাসউদ (রাদিঃ) -এর নিকট দিয়া যাইতে ছিলেন। তাঁহাকে অত্যন্ত চিন্তাযুক্ত দেখিয়া বলিলেন, চিন্তার কোন কারণ নাই। যে বিষয় তাকদীরে আছে তাহা হইবেই আর যে পরিমান রিযিক তোমার নসীবে আছে তাহা তুমি পাইবেই। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলিয়াছেন, হে

মানব মন্ডলী! তোমরা রিযিক অন্বেষণে সংযম ও মিতাচার অবলম্বন কর। কেননা বান্দা উহাই পাইবে যাহা তাহার জন্য লেখা আছে। আর কোন বান্দা দুনিয়া হইতে বিদায় নিবেনা যতক্ষণ না তাহার কাছে তকদীরে লেখা দুনিয়ার হিস্যা পৌঁছে। মানুষ যতক্ষণ রিযিকের ব্যাপারে আল্লাহর তদবীরের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস না রাখিবে এবং উহার প্রতি নির্ভরশীল না হইবে ততক্ষণ লিপ্সা দূরীভূত হইবে না। আর ইহা রিযিক অন্বেষণের ক্ষেত্রে মিতাচার অবলম্বনের মাধ্যমেই লাভ হইয়া থাকে। বরং বিশ্বাস রাখিতে হইবে যে, আল্লাহ তায়ালা ধারণার বাহিরে যে রিযিক দান করেন তাহাই বেশী। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ –

"আর যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে আল্লাহ তায়ালা তাহার অসুবিধা দূর করিয়া দেনএবং তাহাকে এমন জায়গা হইতে রিযিক দান করেন যে সে ধারনাও করিতে পারে না।"

অতএব যদি বান্দার রিযিকের কোন একপথ রুদ্ধ হইয়া যায় তবে আল্লাহর পক্ষ হইতে আসার অপেক্ষা করিবে। রিযিকের জন্য পেরেশান না হওয়া চাই। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালা আপন মুমেন বান্দাকে এমন জায়গা হইতেই দান করিতে চান যে বান্দা ধারনাও না করিতে পারে। সুফিয়ান ছাউরী (রহঃ) বলেন, আল্লাহকে ভয় কর। আমি কোন মুত্তাকী কে অভাব গ্রস্থ দেখি নাই। অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা মুত্তাকী পরহেযগার ব্যক্তির প্রয়োজন এমনিভাবেই রাখিয়া দেন না বরং মুসলমানদের অন্তর তাহার প্রতি আকৃষ্ট করিয়া দেন যাহাতে তাহারা তাহার কাছে রিযিক পৌঁছাইয়া দেয়। মুফাযযাল যববী (রহঃ) বলেন, আমি জনৈক বেদুঈনকে জিজ্ঞাসা করিলাম তোমার রিযিক কোথায় হইতে আসে? সে বলিল, হাজীদের দান। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম হাজীরা যদি চলিয়া যায় তখন কি কর? সে কাঁদিয়া উঠিল এবং বলিল, যদি নির্দিষ্ট রিযিকের মাধ্যমেই বাঁচিয়া থাকিতাম তবে বাঁচিতাম না।

আবু হাযেম (রহঃ) বলেন, আমার মতে দুনিয়াতে দুইটি বস্তু আছে। তন্মধ্যে একটি আমার। উহা যদি সময়ের পূর্বে আসমান যমীনের শক্তি দিয়াও অন্বেষণ করি তবু পাইব না। আর অপরটি অন্যের। উহা আমি পাইও না ভবিষ্যতে পাইবার আশাও নাই। তাই যে ব্যক্তি আমার হিস্যার জিনিষ অন্যের জন্য রাখে সে মূলতঃ অন্যের হিস্যাই আমার নিকট হইতে রাখে। অতএব এই দুই জিনিষের পিছনে জীবন বিনষ্ট করিব কেন? শয়তান যে মানুষকে দারিদ্রের ভয় দেখায় উহা দূর করিবার জন্য ইহা বিরাট ঔষধ যদি ইহার প্রতি ভালভাবে ধ্যান করা হয়।

তিনঃ সবর ও অল্পে তুষ্টিতে কি মর্যাদা এবং লিপসায় কি লাঞ্ছনা তাহা জানিতে হইবে। ইহা জানা হইলে অল্পে তুষ্টির প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি পাইবে। কেননা লোভ লিপ্সা, কষ্ট ও লাঞ্ছনা মুক্ত নহে। আর অল্পে তুষ্টিতে কেবল শাহওয়াত এবং

অপব্যয় হইতে সবর করিতে হয়। এই সবর সম্পর্কে একমাত্র আল্লাহ্ তায়ালা জানেন আর ইহাতে ছাওয়াব রহিয়াছে। পক্ষান্তরে শাহওয়াত ও অপব্যয় মানুষের গোচরীভূত আর উহাতে বিপদ রহিয়াছে। অনন্তর ইহার কারণে আত্মমর্যাদা হারানো যায় এবং হকের অনুসরণ ক্ষমতাও থাকে না। কারণ লোপ লিপসা বৃদ্ধি পাইলে মানুষের প্রতি বেশী মুখাপেক্ষী হইতে হয়। তখন আর মানুষকে হকের দিকে আহবান করা হয় না বরং হকের ব্যাপারে শীথিলতা শুরু করা হয়। আর ইহা দ্বীনের জন্য ধ্বংসাত্মক বিষয়। যে ব্যক্তি আত্মমর্যাদাকে শাহওয়াত ও প্রবৃত্তির উপর প্রাধান্য দেয় না সে নির্বোধ। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলিয়াছেন, মুমেনের মর্যাদা হইল মানুষের কাছে অমুখাপেক্ষী থাকা। অতএব অল্পেতুষ্টিতে রহিয়াছে স্বাধীনতা এবং মর্যাদা। তাই বলা হয়, যাহার প্রতি ইচ্ছা অপ্রত্যাশী হইয়া যাও তাহার নজীর হইয়া যাইবে, যাহার প্রতি ইচ্ছা মুখাপেক্ষী হও তাহার বন্দী অনুগত হইয়া যাইবে আর যাহাকে ইচ্ছা ইহসান ও উপকার কর তাহার আমীর ও কর্তা হইয়া যাইবে।"

চারঃ ইহুদী নাসারা ও অন্যান্য নিম্ন সম্প্রদায়ের ভোগ বিলাসের প্রতি লক্ষ্য করা চাই যাহাদের দ্বীন ধর্ম ও জ্ঞান বুদ্ধি কিছুই নাই। অতঃপর আম্বিয়া আলাইহিমুসালাম, আউলিয়ায়ে কেরাম, খুলাফায়ে রাশেদীন তথা সমস্ত সাহাবায়েকেরাম ও তাবেঈনদের অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করা চাই এবং তাহাদের জীবনী অধ্যয়ন করা, অর্থাৎ ইহার পর বিবেককে স্বাধীনতা দেওয়া চাই যে, কাহাদের অনুসরণ করিবে? সর্ব নিকৃষ্ট ব্যক্তিদের নাকি সর্বোৎকৃষ্ট ব্যক্তিদের ? ইহাতে সবর ও অল্পেতুষ্টি সহজ হইয়া যাইবে। কারণ সে যদি খাবারে ভোগ বিলাস অবলম্বন করিতে চায় তবে গাধা তাহার চাইতে বেশী খাইতে পারিবে আর যদি সঙ্গমে ভোগ বিলাস করিতে চায় তবে শুকর তাহার চাইতে অধিক সঙ্গ সক্ষম। আর যদি পোশাক পরিচ্ছদ ও সাজসজ্জায় ভোগবিলাস করিতে চায় তবে ইহুদীদিগকে তাহার চাইতে অগ্রগামী পাইবে। কিন্তু অল্পেতুষ্টির ক্ষেত্রে কাহাকেও সক্ষম পাইবে না। একমাত্র আম্বিয়া (আঃ) এবং আউলিয়া কেরাম কেই এই ময়দানে পাওয়া যাইবে।

পাঁচঃ মাল সঞ্চয়ে কি আপদ ও কষ্ট, সঞ্চয়ের পর উহা চুরি ডাকাতি ও বিনষ্ট হওয়ার আশংকা এবং মাল না থাকিলে যে শান্তি ও নিরাপত্তা এই সমস্ত বিষয় চিন্তা করিবে। এমনিভাবে অন্যান্য আপদ ছারাও কিয়ামতের দিন দরিদ্রদের তুলনায় পাঁচশত বৎসর পারে জান্নাতে যাইতে হইবে। কারণ অল্পে তুষ্টি অবলম্বন না করিলে তাহাকে দরিদ্রদের দল হইতে বাহির করিয়া ধনীদের দলভুক্ত করিয়া দেওয়া হইবে। এই সমস্ত বিষয়ে চিন্তা করিবে। আর এই চিন্তা পরিপূর্ণ হইবে, যখন সে ধন সম্পদে তাহার তুলনায় নীচে রহিয়াছে এমন ব্যক্তির প্রতি লক্ষ্য করিবে, যাহারা উপরে তাহাদের প্রতি নহে। কারণ শয়তান সর্বদা ঐ সমস্ত লোকের দিকে তাহার দৃষ্টি আকৃষ্ট করে যাহারা ধন দৌলতে তাহার তুলনায় উপরে রহিয়াছে। শয়তান বলে, তুমি মাল সঞ্চয়ে অলসতা করিতেছ কেন?

মালদারেরা কত সুখে স্বাচ্ছন্দে আছে। পক্ষান্তরে দ্বীনের জন্য যাহারা নীচে ও পশ্চাদে রহিয়াছে তাহাদের প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট করে আর বলে, এত কষ্ট করিবে কেন? তুমি আল্লাহকে এত ভয় করিতেছ কেন? অমুক ব্যক্তি তোমার চাইতে বড় আলেম সে তো এত ভয় করেনা। মানুষ সবাই ভোগবিলাসে ও সুখ স্বাচ্ছন্দে লিপ্ত তুমি একা ব্যতিক্রম ধর্মী থাকিবে কেন? এই সমস্ত কুমন্ত্রনা দিতে থাকে। হযরত আবু যর (রাদিঃ) বলেন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাকে উপদেশ দিয়াছেন, কম সম্পদশালীর প্রতি লক্ষ্য কর বেশী সম্পদশালীর প্রতি লক্ষ্য করিওনা। আবু হুরাইরা (রাদিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলিয়াছেন, কোন ব্যক্তির দৃষ্টি যখন ধনসম্পদে অগ্রগামী ব্যক্তির প্রতি পড়ে, তখন সে যেন ধন-সম্পদে পশ্চাদগামী ব্যক্তির প্রতি দৃষ্টিপাত করে।

এই উল্লেখিত পাঁচটি বিষয়ের মাধ্যমে মানুষের মধ্যে অল্পেতুষ্টি সৃষ্টি হইতে পারে। তন্মধ্যে সব চাইতে বেশী কার্যকর হইল সবর ও আশা খাট করা দীর্ঘ আশা না করা। আর এই কথা মনে করিবে যে, অনন্ত কালের সুখ শান্তির জন্য ক্ষণকালের এই সবরের কষ্ট সহ্য করা হইতেছে। যেমন রোগী দীর্ঘদিন রোগমুক্ত থাকার উদ্দেশ্যে অল্প কিছুক্ষন ঔষধের তিক্ততা সহ্য করে।

দানশীলতার ফযীলত বা মাহাত্ম

বান্দা যখন ধনশূণ্য থাকে তখন তাহার উচিৎ সবর, অল্পে তুষ্টি অবলম্বন করা, এবং লিপসা হ্রাস করিয়া ফেলা। আর যখন ধনবান হয় তখন লিপসা বাদ দিয়া দানশীলতার নীতি অবলম্বন করা। কেননা দানশীলতা আম্বিয়া আলাইহিমুস্ সালাম -এর নীতি ও চরিত্র। ইহা নাজাতের একটি মৌলিক উপায়। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলিয়াছেন, দানশীলতা হইল জান্নাতের একটি বৃক্ষ। উহার ডাল সমূহ যমীনের দিকে ঝুলিয়া আছে। কেহ যদি উহার কোন একটি ডাল ধারণ করে তবে ঐ ডাল তাহাকে জান্নাতে নিয়া পৌছাইবে।

হযরত জাবের (রাদিঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, হযরত জিব্রাঈল (আঃ) -এর মাধ্যমে আমার কাছে আল্লাহ তায়ালার এই বানী পৌছিয়াছে যে, এই দ্বীন আমি নিজের জন্য পছন্দ করিয়াছি। ইহার উৎকর্ষতা লাভ হইবে একমাত্র দানশীলতা ও সদাচারের মাধ্যমে। অতএব যতদূর সম্ভব এই বিষয়দ্বয়ের মাধ্যমে এই দ্বীনের সম্মান কর। অপর বর্ণনায় আছে, যতক্ষণ তোমরা এই দ্বীনের সহিত থাক এই বিষয়দ্বয়ের মাধ্যমে উহার সম্মান কর। হযরত আয়েশা (রাদিঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালা তাহার প্রত্যেক ওলীকে সদাচারী, সদাচরিত্রবান ও দানশীল করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। হযরত জাবের (রাদিঃ) বর্ণনা করেন, বাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) -এর নিকট জিজ্ঞাসা করা হইল, কোন আমল সর্বশ্রেষ্ট। উত্তরে বলিলেন, সবর ও দানশীলতা। আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালা দুইটি চরিত্র পছন্দ করেন আর দুইটি চরিত্র অপছন্দ

করেন। পছন্দনীয় চরিত্রদ্বয় হইতেছে, সচ্চরিত্র ও দানশীলতা আর অপছন্দনীয় চরিত্রদ্বয় হইতেছে হৃদয়ের কাঠিন্য ও কৃপনতা। আল্লাহ তায়ালা যখন কোন বান্দার ব্যাপারে কল্যাণের ইচ্ছা করেন তখন তাহার মাধ্যমে মানুষের প্রয়োজন ও অভাব মোচন করেন। মেকদাম ইবনে শুরাইহ আপন পিতা হইতে এবং তিনি তাঁহার পিতা হইতে বর্ণনা করেন, তাঁহার পিতা বলেন, আমি একদা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) -এর কাছে আরজ করিলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ। আমাকে এমন একটি আমলের কথা বলিয়া দিন যাহা আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাইয়া দিবে। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলিলেন, মাগফিরাত অপরিহার্য কর, বিষয় হইল মানুষকে খানা খাওয়ানো, সালাম ব্যাপক করিয়া দেওয়া এবং উত্তম পন্থায় কথা বলা। আবু হুরাইরা (রাদিঃ) বর্ণনা করেন। দানশীলতা জান্নাতের একটি বৃক্ষ। যে ব্যক্তি দানশীল সে ঐ বৃক্ষের একটি শাখা ধারণ করিল। অতএব ঐ শাখা তাহাকে জান্নাতে পৌঁছানো পর্যন্ত ছাড়িবেনা। আবু সাঈদ খুদরী (রাদিঃ) হইতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন, তোমরা আমার দয়াশীল বান্দাদের নিকট অনুগ্রহ কামনা কর এবং তাহাদের আশ্রয়ে জীবন যাপন কর। কেননা আমি তাহাদের মধ্যে আমার দয়া পূর্ণ করিয়া দিয়াছি। কঠিন হৃদয়বানদের কাছে অনুগ্রহ প্রার্থনা করিওনা। কেননা আমি তাহাদের মধ্যে আমার গোস্বাপূর্ণ করিয়া দিয়াছি। হযরত ইবনে আব্বাস (রাদিঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলিয়াছেন, তোমরা দানশীলদের ত্রুটি বিচ্যুতি ক্ষমা করিয়া দাও। কেননা দানশীল ব্যক্তি যখনই হোচট খাইয়া পড়িয়া যাইতে চায় তখনই তাহার হাত ধরিয়া ফেলেন, ইবনে মাসউদ (রাদিঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, একটি উটের কুঁজে ছুরি যত দ্রুত পৌঁছে তাহার চাইতেও অধিক দ্রুত গতিতে অন্নদানকারীর প্রতি তাহার রিযিক পৌঁছে। আল্লাহ তায়ালা অন্নদানকারীকে লইয়া ফেরেশতাদের সহিত গর্ব করেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, আল্লাহ তায়ালা দানশীল, তিনি দানশীলতা পছন্দ করেন। উন্নত চরিত্রকে পছন্দ করেন আর নিম্ন চরিত্র অপছন্দ করেন। আনাস (রাদিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইসলামের স্বার্থে যাহাই চাওয়া হইত তাহাই দান করিতেন। একবার এক ব্যক্তি আসিয়া কিছু চাহিল। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাহাকে দুই পাহাড়ের মাঝখানে সদকার যত ছাগল ছিল সব দিয়াছেন। সে আপন গোত্রের কাছে ফিরিয়া বলিল, হে আমার গোত্রীয় ভাইয়েরা। তোমরা ইসলাম গ্রহণ করিয়া ফেল। কেননা মুহাম্মদ সাল্লালালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন দান করেন যে, দারিদের আর আশংকা থাকেনা। ইবনে ওমর (রাদিঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালার কিছু বিশেষ বান্দা আছে তাহাদিগকে বিশেষ ভাবে নেয়ামত দান করেন যাহাতে মানুষের উপকার হয়। যদি তাহারা ঐ নেয়ামতে কৃপণতা করে তবে ঐ নেয়ামত তাহাদের নিকট হইতে ছিনাইয়া অন্যের কাছে

সোপর্দ করিয়া দেন। হেলালী (রাদিঃ) নামক জনৈক সাহাবী বর্ণনা করেন, একদা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) -এর কাছে বনি আম্বর গোত্রের কিছু লোক বন্দি হইয়া আসিল। তিনি সবাইকে হত্যা করার নির্দেশ দিলেন কেবল এক ব্যক্তিকে রেহাই দিলেন, হযরত আলী (রাদিঃ) বলিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহ এক, দ্বীন এক, অপরাধ ও এক, সবাইকে হত্যা করার নির্দেশ দিলেন আর এই এক ব্যক্তিকে রেহাই দিলেন কেন? রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলিলেন, এইমাত্র জিব্রাঈল (আঃ) আমার কাছে নাযিল হইয়া বলিয়াছেন, সমস্ত অপরাধীকে হত্যা করিয়া ফেলুন কেবল এই এক ব্যক্তিকে রেহাই দিন, কেননা আল্লাহ তায়ালা তাহার দানশীলতা গুনের কদর করিয়াছেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, প্রত্যেক জিনিসের একটি ফল রহিয়াছে। ইহসান ও অনুগহের ফল হইল নাজাতের দ্রুত আগমন। ইবনে ওমর (রাদিঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলিয়াছেন, দানশীলের খাবার ঔষধ আর কৃপনের খাবার রোগ। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, যাহার কাছে আল্লাহর নেয়ামত বেশী থাকে তাহার কাছে মানুষের হকও বেশি থাকে। অতএব যে ব্যক্তি ঐ হক আদায় না করে তাহার নেয়ামত ধ্বংস ও বিনষ্টের সম্মুখীন হয়। একদা হযরত ঈসা (আঃ) বলিলেন, তোমরা ঐ জিনিষ অধিক পরিমানে অবলম্বন কর যাহা আগুনে ভক্ষণ করিতে পারিবেনা। জিজ্ঞাসা করা হইল ঐ জিনিষটি কি? উত্তরে বলিলেন, ইহসান ও পরোপকার।

হযরত আয়েশা (রাদিঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, জান্নাত হইল দানশীলদের ঘর। আবু হুরাইরা (রাদিঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, দানশীল আল্লাহর নিকটবর্তী মানুষের নিকটবর্তী, জান্নাতের নিকটবর্তী আর জাহান্নাম হইতে দূরে। পক্ষান্তরে কৃপন ব্যক্তি আল্লাহর নিকট হইতে দূরে, মানুষের নিকট হইতে দূরে, জান্নাত হইতে দূরে কিন্তু জাহান্নামের নিকটবর্তী। দানশীল জাহেল আল্লাহর কাছে কৃপন আলেমের তুলনায় অধিক পছন্দনীয়। আর সর্বাপেক্ষা ধ্বংসাত্মক ব্যধি হইল কৃপনতা, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, যে ইহসানের যোগ্য তাহার প্রতিও ইহসান কর যে যোগ্য নহে তাহার প্রতিও ইহসান কর। যদি যোগ্য হইয়া থাকে তবে যথা স্থানে ইহসান করা হইয়াছে আর যদি যোগ্য না হইয়া থাকে তবে তুমিতো ইহসান করার যোগ্য। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, আমার উম্মতের দানশীল ব্যক্তিরা নামায রোযার কারণে জান্নাতে যাইবেনা তাহারা দানশীলতার এবং মুসলমানদের কল্যাণ কামনার কারণে জান্নাতে যাইবে। আবু সাঈদ খুদরী (রাদিঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, আল্লাহ তায়ালা আপন বান্দাদের ইহসান ও উপকারের বিভিন্ন উপায় সৃষ্টি করিয়া দিয়াছেন।

একঃ ইহসান ও দানকরা তাহাদের কাছে প্রিয় করিয়া দিয়াছেন।

দুইঃ ইহসানকারী ও দাতাদের ভালবাসা মানুষের অন্তরে সৃষ্টি করিয়া দিয়াছেন।

তিনঃ দান গ্রহিতাদের দৃষ্টি দাতাদের প্রতি ফিরাইয়া দিয়াছেন অর্থাৎ তাহাদের প্রতি আকৃষ্ট করিয়া দিয়াছেন।

চারঃ দান খয়রাত তাহাদের জন্য এমন সহজ করিয়া দিয়াছেন যেমন আল্লাহ তায়ালা অতি সহজে শুস্ক জমিতে বৃষ্টি বর্ষন করেন আর উহার সাহায্যে ঐ জমি এবং অধিবাসীকে পুনর্জীবিত করেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, প্রত্যেক ভালকাজ সদকা, মানুষ নিজের এবং পরিবারবর্গের জন্য যাহা খরচ করে তাহাও সদকা হিসাবে লেখা হয়, মানুষ আপন ইজ্জত আবরু রক্ষার্থে যাহা খরচ করে তাহাও সদকা। মানুষ যে কোন খরচ করে আল্লাহ তায়ালা উহার প্রতিদান দিয়া দেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, প্রত্যেক ভালকাজ সদকা, ভালকাজের প্রতি পথপ্রদর্শকও কর্তার ন্যায় ছাওয়াবের অধিকারী হইবে। আর আল্লাহ তায়ালা দুঃখীদের সাহায্যকারীকে ভালবাসেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, তুমি ধনী হও দরিদ্র হও যাহারই কোন উপকার কর তাহা তোমার জন্য সদকা।

বর্ণিত আছে, আল্লাহ তায়ালা হযরত মূসা (আঃ) -এর প্রতি ওহী পাঠাইয়াছেন, হে মূসা! তুমি সামেরীকে হত্যা করিবেনা যেহেতু সে দানশীল।

হযরত জাবের (রাদিঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) একদা কাইস ইবনে সা'দ কে সেনাপতি করিয়া একটি সেনাদল জিহাদের জন্য পাঠাইলেন, জিহাদের পর কাইস (রাদিঃ) তাহাদের জন্য নয়টি উট জাবেহ করিলেন। এই ঘটনা তাহারা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) -এর নিকট বর্ণনা করিলেন তিনি বলিলেন বদান্যতা এই পরিবারের বৈশিষ্ট্য।

হযরত আলী (রাদিঃ) বলেন, দুনিয়া যখন তোমার দিকে আসে তখন উহা খরচ কর। কেননা উহা হ্রাস পাইবেনা। আর যখন তোমার নিকট হইতে চলিয়া যাইতে থাকে তখনও খরচ কর। কেননা উহা স্থায়ী হইবে না। অতঃপর তিনি নিম্নোক্ত কবিতা আবৃত্তি করিলেন-

"দুনিয়া যখন তোমার দিকে আসে তখন যত খরচই কর কমিবেনা। আর যখন তোমার নিকট হইতে ফিরিয়া যায় তখন তো খরচ করা বেশী প্রয়োজন। আর ফিরিয়া যাওয়ার দরুন আল্লাহর প্রশংসা কর।"

করম বা দানশীলতার ব্যাখ্যা

হযরত মুয়াবিয়া (রাদিঃ) হযরত হাসান ইবনে আলী (রাদিঃ) -এর কাছে মারোয়্যাত, নাজদাহ ও করম এই তিনটি আরবী শব্দের অর্থ জিজ্ঞাসা করিলেন।

হাসান (রাদিঃ) উত্তরে বলিলেন, মারোয়্যাত হইল, আপন দ্বীন ও সত্তার হেফাজত করা, উত্তমরূপে মেহমানদারি করা এমনকি বিতর্ক এবং অপছন্দনীয় কোন কাজও শালীনতা বজায় রাখিয়া করা। নাজদাহ হইল, প্রতিবেশীর বিপদাপদ দূরীভূত করা সর্ব ক্ষেত্রে ধৈর্য ধারণ করা। আর করম হইল, চাওয়ার আগেই দান করা, যথা সময়ে খাবার খাওয়ানো, দানকরা সত্ত্বেও ভিক্ষুকের সাহিত নম্র আচরণ করা।

হযরত হাসান ইবনে আলী (রাদিঃ) -এর দানশীলতা

একবার হযরত হাসান (রাদিঃ) -এর কাছে জনৈক ব্যক্তি প্রয়োজন উল্লেখ পূর্বক একটি আবেদন পত্র পাঠাইলেন। তিনি উহা পাইয়া না পড়িয়াই বলিলেন, তোমার প্রয়োজন মিটানো হইবে। কোন এক ব্যক্তি বলিল, হে নবী দৌহিত্র! আপনি আবেদন পত্রটি পড়িয়া তারপর উত্তর দিতেন। হযরত হাসান (রাদিঃ) বলিলেন, যতক্ষণ আমি তাহার এই আবেদন পত্র পড়িব ততক্ষণ সে আমার কাছে লাঞ্ছিত অবস্থায় থাকিবে। আর কিয়ামতের দিন আল্লাহর দরবারে আমাকে জবাবদিহি করিতে হইবে যে, এই ব্যক্তিকে তুমি এতক্ষণ লাঞ্ছিত করিলে কেন?

ইবনে সিমাক বলেন, বড়ই আশ্চর্যের বিষয় যে, মানুষ টাকা দিয়া গোলাম ও বাঁদী খরিদ করে, দান ও পরোপকার করতঃ স্বাধীন লোক খরিদ করেনা। জনৈক বেদুঈনকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল, তোমাদের সরদার কে? উত্তরে বলিয়াছিল, যে আমাদের গালি সহ্য করে, ভিক্ষুককে দান করে এবং জাহেল ও মুর্খকে ক্ষমা করিয়া দেয়।

প্রকৃত দানশীলতা হযরত আলী ইবনে হুসাইন (রাদিঃ) -এর ভাষায়

হযরত আলী ইবনে হুসাইন (রাদিঃ) বলেন, যে ব্যক্তি আবেদন করার পর মাল দান করে সে প্রকৃত দানশীল নহে বরং প্রকৃত দানশীল ঐ ব্যক্তি যে, আল্লাহ তায়ালা অনুগত বান্দাদের যে হক নির্ধারন করিয়া দিয়াছেন উহা আবেদন ব্যতিরেকেই দিয়া দেয়। আর ইহার জন্য কোন শোকরিয়ারও আশা করে না।

হযরত হাসান বসরী (রহঃ) -এর মতে দানশীল

হাসান বসরী (রহঃ) কে জিজ্ঞাসা করা হইল, দানশীলতা কাহাকে বলে? তিনি উত্তরে বলিলেন, আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে সম্পদ দান করাকে বলে। অতঃপর জিজ্ঞাসা করা হইল, সতর্কতা ও বিচক্ষনতা কাহাকে বলে? উত্তরে বলিলেন, আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যেই সম্পদ দান করাকে। তারপর জিজ্ঞাসা করা হইল অপব্যয় কাহাকে বলে? উত্তরে বলিলেন, নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব লাভের উদ্দেশ্যে সম্পদ ব্যয় করাকে। হযরত জাফর সাদেক (রহঃ) বলেন জ্ঞানের চাইতে বেশী সহায়ক কোন সম্পদ নাই, মূর্খতার চাইতে বড় কোন বিপদ নাই এবং পরামর্শের তুলনায় বড় কোন শক্তি নাই। আল্লাহ তায়ালা স্বয়ং বলেন, আমি অতিদানশীল ও

দাতা, কোন কৃপন আমার হাত হইতে রক্ষা পাইবেনা। কৃপণতা হইল কুফরের অন্তুর্ভূক্ত, আর কাফের জাহান্নামী। দানশীলতা ঈমানের অন্তর্ভূক্ত। আর ঈমানদারেরা জান্নাতী।

হযরত হুযাইফা (রাদিঃ) বলেন, বহু গোনাহগার এমন যাহারা অভাব অনটনের মধ্য দিয়া কালাতিপাত করে তাহারা দানশীলতার কারণে জান্নাতে চলিয়া যাইবে। আহনাদ ইবনে কাইস (রহঃ) জনৈক ব্যক্তির হাতে একটি দেরহাম দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন এই দেরহামটি কাহার? সে উত্তরে বলিল, আমার। তিনি বলিলেন এই দেরহাম তোমার হইবেনা যতক্ষণ না তোমার হাত হইতে বাহির হইয়া যায়। এই মর্মেই বলা হইয়াছে-

"তুমি হইলে মালের জন্য যখন উহা হাতে রাখ, আর যখন উহা খরচ করিয়া ফেল তখন উহা তোমার।"

ওয়াসিল ইবনে আতা কে গায্যাল বলা হইত এইজন্য যে, তিনি গায্যাল অর্থাৎ যাহারা সূতা কাটিত তাহাদের সাহিত উঠাবসা করিতেন। তিনি যখনই কোন অবলা মহিলাকে দেখিতেন তখন তাহাকে কিছু না কিছু দান করিয়া দিতেন। আসমায়ী (রাদিঃ) বর্ণনা করেন, একদা হাসান (রাদিঃ) হুসাইন (রাদিঃ) এর প্রতি কবিদিগকে দান করার কারণে গঞ্জনা মুলক চিঠি লিখিয়া পাঠাইলেন, হুসাইন (রাদিঃ) উত্তরে লিখিলেন, উত্তম মাল উহাই যা দ্বারা আবরু ইজ্জত রক্ষা পায়। সুফিয়ান ইবনে উয়াইনাকে জিজ্ঞাসা করা হইল সাখা বা দানশীলতা কাহাকে বলে? তিনি উত্তরে বলিলেন, সাখা বা দানশীলতা হইল ভাইদের সহিত সদাচার ও অর্থ সম্পদ ফিরাইয়া দেওয়া। অতঃপর তিনি বলিলেন, আমার পিতা উত্তরাধিকার সূত্রে পঞ্চাশ হাজার দেরহাম লাভ করিয়াছিলেন। তিনি সমস্ত দেরহাম থলিতে পূর্ণ করিয়া ভাইদের মধ্যে বন্টন করিয়া দেন আর বলেন, আমি আমার ভাইদের জন্য আল্লাহর কাছে জান্নাত প্রার্থনা করিয়াছি। এখন মালের ব্যাপারে কি তাহাদের সহিত কার্পণ্য করিব? ইহা কখনও হইতে পারে না। হযরত হাসান (রাদিঃ) বলেন, উপস্থিত সম্পদ মনে প্রানে চেষ্টা করিয়া দান করিয়া দেওয়াই চূড়ান্ত দানশীলতা।

জনৈক বিজ্ঞ ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করা হইল, আপনার কাছে সর্বাপেক্ষা প্রিয় কে? তিনি উত্তরে বলিলেন, যে আমাকে সবচাইতে বেশী দান করিয়াছে। আবার জিজ্ঞাসা করা হইল, যদি এমন কেহ না থাকে? উত্তরে বলিলেন, তবে ঐ ব্যক্তি যাহাকে আমি সব চাইতে বেশী দান করিয়াছি। আব্দুল আযীয ইবনে মারওয়ান (রহঃ) বলেন, কেহ যদি আমাকে তাহার উপকার করার সুযোগ দেয় তবে তাহার প্রতি আমার যতটুকু অনুগ্রহ হইবে আমার প্রতিও তাহার ততটুকু অনুগ্রহ হইবে। খলীফা মাহদী শাবীব ইবনে শাইবাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমার ঘরে মানুষের অবস্থা কেমন দেখিতেছ? শাবীব উত্তরে বলিলেন, এক ব্যক্তি আশা লইয়া আসে আর খুশী হইয়া ফিরিয়া যায়। জনৈক ব্যক্তি আব্দুল্লাহ ইবনে জাফরের সম্মুখে দুইটি চরণ আবৃত্তি করিয়াছিল যাহার অনুবাদ নিম্নে প্রদত্ব হইল-

"উপকার তখনই উপকার হিসাবে গণ্য হয় যখন যথাস্থানে পতিত হয়। তাই উপকার করিলে আল্লাহর উদ্দেশ্যে করিবে অথবা আত্মীয় স্বজনকে করিবে অন্যথা বিরত থাকিবে।"

আব্দুল্লাহ কবিতা শুনিয়া বলিলেন, ইহা দ্বারা তো মানুষ কৃপন হইয়া যাইবে। আমি মুষলধার বৃষ্টির ন্যায় দান করিতে থাকিব। যদি ভাল লোকের নিকট পৌঁছে তবে তাহারা ইহার হকদার আর যদি খারাপ লোকের নিকট পৌঁছে তবে ইহা আমার মান উপযোগী হইয়াছে।

দানশীলদের কতিপয় ঘটনা

হযরত আয়েশা (রাদিঃ) -এর দানশীলতা

মুহাম্মদ ইবনে মুনকাদির হযরত আয়েশা (রাদিঃ) -এর খাদেমা উম্মে দিরবা হইতে বর্ণনা করেন, একদা ইবনে যুবাইর (রহঃ) হযরত আয়েশা (রাদিঃ) -এর খেদমতে দুইটি থলি ভরতি করিয়া একলক্ষ আশি হাজার দেরহাম পাঠাইলেন। হযরত আয়েশা (রাদিঃ) ঐ গুলি একটি খাঞ্চায় করিয়া মানুষের মধ্যে বন্টন করিয়া দেন। সন্ধ্যায় আমাকে বলিলেন, আমার ইফতারী আন। আমি রুটি আর যয়তুনের তৈল আনিয়া হাজির করিলাম। আর বলিলাম, আজ যে এত দেরহাম বন্টন করিয়াছেন উহা হইতে এক দেরহাম দ্বারা ইফতারের জন্য কিছু গোসত খরিদ করিতে প্যারিলেন না? হযরত আয়েশা (রাদিঃ) বলিলেন, আরে! স্মরণ করাইয়া দিলেত তাহাই করিতাম।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাদিঃ) -এর দানশীলতা

আবান ইবনে উছমান (রহঃ) বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাদিঃ) -এর কিছু অনিষ্ট করার ইচ্ছায় কুরাইশ বংশের নেতৃবৃন্দের কাছে যাইয়া বলিল, আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাদিঃ) আমাকে এই বার্তা দিয়া পাঠাইয়াছেন যে, আগামীকাল সকালে তাঁহার ঘরে আপনাদের দাওয়াত, পরদিন সকালে সকলেই হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাদিঃ) -এর বাড়ীতে যাইয়া হাজির। তিনি সমবেত হওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা সব বৃত্তান্ত বর্ণনা করিল। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাদিঃ) কিছু ফলমূল খরিদ করিয়া আনার নির্দেশ দিলেন এবং কিছু লোককে রুটি তৈরি করার নির্দেশ দিলেন। মেহমানদের সম্মুখে ফল হাজির করা হইল। তাহারা ফল খাইতে না খাইতেই দস্তরখান বিছাইয়া দেওয়া হইল। সবাই তৃপ্তি সহকারে খানা খাইয়া চলিয়া গেলেন। অতঃপর খাদেমগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আজ যে পরিমান খরচ হইয়াছে প্রতিদিন এই পরিমাণ খরচ করা যাইতে পারে কি? তাহারা বলিল, জি হ্যাঁ। তিনি বলিলেন, তাহা হইলে প্রতিদিনই তাহারা আমার এখানে নাস্তা করুক।

হযরত মুয়াবিয়া (রাদিঃ) -এর দানশীলতা

মুসআব ইবনে যুবাইর বর্ণনা করেন, হযরত মুয়াবিয়া (রাদিঃ) যখন হজ্জ শেষে মদীনা মুনাওয়ারা হইয়া যাইতেছিলেন তখন হযরত হুসাইন (রাদিঃ) হযরত হাসান (রাদিঃ) কে বলিলেন, মুয়াবিয়া (রাদিঃ) -এর সহিত সাক্ষাৎও করিবেন না তাহাকে সালামও করিবেন না। কিন্তু তিনি যখন মদীনা হইতে বাহির হইয়া গেলেন তখন হযরত হাসান (রাদিঃ) বলিলেন, আমাদের কাছে তাঁহার ঋন রহিয়াছে। অবশ্যই তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে হইবে। এই বলিয়া তিনি সাওয়ারীর উপর আরোহন করত তাঁহার সহিত যাইয়া সাক্ষাৎ করিলেন, তাঁহাকে সালাম করিলেন এবং ঋনের কথাও শুনাইলেন। একটি বখতী উটের উপর আশি হাজার দীনার দিয়া পাঠাইলেন। উটটির চলিতে কষ্ট হইতে ছিল। অন্য উটের পিছনে পড়িয়া যাওয়ার কারণে মানুষে উহাকে হাঁকাইয়া নিতেছিল। হযরত মুয়াবিয়া (রাদিঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন ইহা কি? ব্যাপারটি বলা হইল। তখন তিনি বলিলেন দীনার সহ উটটি আবু মুহাম্মদ ইমাম হাসানের কাছে পাঠাইয়া দাও।

ইমাম ওয়াকেদী ও খলীফা মামূনুর রশীদের দানশীলতা

ওয়াকেদ পিতা মুহাম্মদ ওয়াকেদী সম্পর্কে বর্ণনা করেন, একদা তিনি খলীফা মামুনুররশীদের নিকট লিখিয়া পাঠাইলেন যে, তিনি অত্যন্ত ঋণগ্রস্থ হইয়া পড়িয়াছেন। এখন আর তিষ্টিতে পারিতেছেননা। মামূনুর রশীদ চিঠির অপর পৃষ্ঠার লিখিয়া দিলেন যে, আপনার মধ্যে দুইটি গুন রহিয়াছে। একটি দানশীলতা অপরটি হায়া। দানশীলতার কারণে আপনার মাল সব চলিয়া গিয়াছে আর হায়ার কারণে আমার কাছে আপন প্রয়োজন প্রকাশ করিতে পারিতেছেন না। যাহাই হউক আমি আপনাকে একলক্ষ দেরহাম দেওয়ার নির্দেশ দিলাম। যদি যথোপযুক্ত হইয়া থাকে তবে আপনি মুক্ত হস্তে মানুষকে দান করুন নচেৎ ত্রুটি আপনারই। আর আপনি যখন খলীফা হারূনুর রশীদের পক্ষ হইতে কাযী নিযুক্ত ছিলেন তখন আমাকে একটি হাদীছ শুনাইয়া ছিলেন, যে, মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক ইমাম যুহরী হইতে আর তিনি হযরত আনাস (রাদিঃ) হইতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হযরত যুবাইর ইবনে আউওয়ামকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন, হে যুবাইর। রিযিকের চাবিকাঠি আল্লাহর আরশের বরাবর। তিনি প্রত্যেক বান্দার প্রতি তাহার খরচ অনুযায়ী রিযিক পাঠাইয়া থাকেন। যে ব্যক্তি বেশী খরচ করে তাহার প্রতি বেশী পাঠানো হয় আর যে কম খরচ করে তাহার প্রতি কম পাঠানো হয়। আর এই ব্যাপারে আপনি আমার চাইতে ভাল জানেন। ওয়াকেদী বলেন, আল্লাহর কসম মামুন যে হাদীছের আলোচনা করিয়াছে ইহা আমার কাছে তাহার একলক্ষ দেরহামের হাদিয়া হইতে উত্তম।

ইমাম হাসান (রাদিঃ) -এর দানশীলতা

একবার এক ব্যক্তি হযরত হাসান (রাদিঃ) -এর নিকট আপন প্রয়োজন জানাইল। হাসান (রাদিঃ) বলিলেন, তুমি যে আমার নিকট সাহায্য চাহিয়াছ ইহার হক অতি বড়। কিন্তু তোমার প্রয়োজন কতটুকু তাহা জানা আমার জন্য দুস্কর। তুমি যে পরিমাণ পাওয়ার যোগ্য সেই পরিমান আমার কাছে নাই। অধিকন্তু আল্লাহর রাস্তায় যতবেশীই দেওয়া হয় তাহা কমই বটে। যাহাই হউক তোমার প্রয়োজন অনুপাতে আমি দিতে পারিবনা তবে তুমি যদি অল্পেতুষ্ট থাক এবং অধিক দানের জন্য আমাকে অতিরিক্ত কষ্টে না ফেল তবে উপস্থিত যাহা আছে তাহা তোমার সামনে পেশ করিব। ঐ ব্যক্তি বলিল, হে নবী দৌহিত্র আপনি যাহাই দেন তাহাই সন্তুষ্ট চিত্তে গ্রহণ করিব। দান করিলে কৃতজ্ঞ হইব আর দান না করিলে আপনাকে অপারগ মনে করিব। হযরত হাসান (রাদিঃ) আপন হিসাব রক্ষক ডাকাইলেন। আপন জরুরী খরচাদির হিসাবের পর বলিলেন, তিন লক্ষ দেরহামের অতিরিক্ত যাহা হয় তাহা নিয়া আস। সে পঞ্চাশ হাজার দেরহাম আনিয়া উপস্থিত করিল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন। পাঁচ হাজার দীনার কোথায়? উত্তরে বলিল, আমার কাছে রহিয়াছে। তিনি বলিলেন, ঐ গুলিও নিয়া আস। ঐ গুলিও উপস্থিত করা হইল। অতঃপর হযরত হাসান (রাদিঃ) দেরহাম দীনার সবগুলি ঐ ব্যক্তিকে দিয়া বলিলেন কুলি নিয়া আস। সে দুইজন কুলি নিয়া আসিল। হাসান (রাদিঃ) কুলির পারিশ্রমিক বাবত আপন চাদরটিও দিয়া দিলেন। হিসাব রক্ষক বলিল আমাদের জন্য একটি দেরহামও রখিলেন না? তিনি বলিলেন, আল্লাহর কাছে বিরাট প্রতি দানের আশা করিও।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাদিঃ) -এর দানশীলতার ঘটনা

হযরত ইবনে আব্বাস (রাদিঃ) যখন বসরার গভর্নর ছিলেন তখন তথাকার কতিপয় আলেম তাঁহার নিকট আসিয়া বলিলেন, আমাদের এক প্রতিবেশী রহিয়াছে সে এত নামায রোযা করে যে, প্রত্যেকেই তাহার মত হইতে চায় সে আপন কন্যাকে ভ্রাতুষ্পুত্রের কাছে বিবাহ দিয়াছে কিন্তু টাকা পয়সার অভাবে স্বামীগৃহে পাঠাইতে পারিতেছেনা। হযরত ইবনে আব্বাস (রাদিঃ) তাহাদের হাত ধরিয়া ঘরের কোনে লইয়া গেলেন, এবং সিন্দুক খুলিয়া ছয়টি থলি বাহির করিলেন এবং বলিলেন এই গুলি নিয়া চল। তাহারা থলি গুলি নিয়া চলিলেন তারপর তাহার মনে ধ্যানের উদয় হইল যে, এই টাকা পয়সার কারণে তাহার নামায রোযা বিঘ্নিত হইবে। দুনিয়ার কারণে আল্লাহর ইবাদত বিঘ্নিত হইবে ইহা হইতে পারে না। তাই চল আমরা যাইয়া স্বয়ং তাহার প্রয়োজন মিটাইয়া দিব এবং কন্যাকে স্বামীগৃহে পাঠানোর ব্যবস্থা করিয়া দিব। পরিশেষে তাহাই করিলেন এবং সন্তোষ জনক ভাবেই করিলেন।

আব্দুল্লাহ বিন সা'দ (রহঃ) এর দানশীলতা।

একবার মিশরে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছিল। তখন সেখানাকার শাসক ছিলেন আব্দুল্লাহ বিন সাদ। তিনি বলিলেন, আল্লাহর কসম আমি শয়তানকে স্পষ্টরূপে জানাইয়া দিব যে, আমি তাহার দুশমন। এই বলিয়া তিনি স্বচ্ছলতা ফিরিয়া না আসা পর্যন্ত অভাব গ্রস্থদিগকে সাহায্য করিতে রহিলেন। যখন তিনি অবসর প্রাপ্ত হন তখন তাঁহার কাছে ব্যবসায়ীদের দশ হাজার দেরহাম পাওনা ছিল। তিনি আপন স্ত্রীদের পঞ্চাশ কোটি টাকার গহনা বন্ধক রাখিলেন। পরে যখন ঋণ পরিশোধ করতঃ গহনাপাতি মুক্ত করার মত সুযোগ হইল না তখন পাওনাদারগণের নিকট লিখিয়া পাঠাইলেন যে, গহনাপাতি বিক্রয় করিয়া নিজ নিজ পাওনা নিয়া নাও আর অবশিষ্ট টাকা যাহারা আমার কোন দান্ পায় নাই তাহাদিগকে দিয়া দাও।

আবু তাহের ইবনে কাছীর -এর দানশীলতা

আবু তাহের ইবনে কাছীর শিয়া ছিলেন। এক ব্যক্তি তাহার কাছে আসিয়া বলিল হযরত আলী (রাদিঃ) -এর দোহাই দিয়া প্রার্থনা করিতেছি, আমাকে অমুক বাগানটি দিয়া দিন। আবু তাহের বলিলেন, যাও, তোমাকে ঐ বাগানটি দিয়া দিলাম আর উহার সাথে যে বাগান রহিয়াছে উহাও দিয়া দিলাম। সংলগ্ন বাগানটি উহার কয়েক গুন বড় ছিল।

মা'ন ইবনে যায়েদা বসরার গর্ভর্ণর ছিলেন, একবার জনৈক কবি তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেল। দীর্ঘ দিন অপেক্ষা করার পরও সাক্ষাতের সুযোগ হইল না। অবশেষে একদিন তাহার কোন এক খাদেমকে বলিল, আমীর যখন বাগানে বাহির হন তখন অনুগ্রহ করিয়া আমাকে জানাইবে। আমীর যখন বাগানে বাহির হইলেন তখন ঐ খাদেম প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী কবিকে জানাইল। কবি একটি কাষ্ঠফলকে একটি চরণ লিখিয়া পানিতে ভাসাইয়া দিল। পানির স্রোতের গাতি ছিল বাগানের দিকে। আমীর পানির কাছে বসা ছিলেন। হঠাৎ কাষ্ঠ ফলকটি আমীরের দৃষ্টি গোচর হইল। তিনি উঠাইয়া দেখিলেন উহাতে লেখা আছে -

يـايـجـود مـعـن تـاج مـعـنـا بـحـاجـنـى × فـمـا لـى الى مـعـن سـواك شـفـيـع

"হে মা'নের বদান্যতা! তুমিই মা'নকে আমার প্রয়োজনের কথা জানাইয়া দাও। কারণ তোমাকে ছাড়া আমার আর কেহ নাই যে মা'নের কাছে আমার জন্য সুপারিশ করিবে।"

মা'ন জিজ্ঞাসা করিলেন, এই ব্যক্তি কে ? তখন কবিকে ডাকা হইল। তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল, তুমি এই কবিতা কিভাবে পড়িয়াছ? সে চরণটি পাঠ করিয়া শুনাইল। মান তৎক্ষণাৎ দশহাজার দেরহাম দিয়া দিলেন এবং কাষ্ট ফলকটি বিছানার নীচে রাখিয়া দিলেন। পরদিন আবার ঐ কাষ্ট ফলকটি বাহির

করিয়া পড়িলেন এবং ঐ ব্যক্তিকে আরো একলক্ষ দেরহাম দিয়া দিলেন। এই বার সে চিন্তায় পড়িয়া গেল না জানি এই টাকা আমার নিকট হইতে ছিনাইয়া নেওয়া হয়। তাই সে চলিয়া গেল। তৃতীয় দিন আমীর পুনরায় কাষ্ঠ ফলকটি বাহির করিয়া পড়িলেন এবং ঐ ব্যক্তিকে ডাকাইলেন। কিন্তু তাহাকে আর পাওয়া গেল না। আমীর বলিলেন, যতক্ষণ আমার কাছে একটি দীনার বা দেরহামও থাকিত ততক্ষণ আমি তাহাকে দান করিতাম।

ইমাম হাসান ও ইমাম হুসাইন (রাদিঃ) -এর জনৈকা বৃদ্ধা মহিলাকে দানশীলতা

আবুল হাসান মাদায়েনী বর্ণনা করেন, একদা হযরত হাসান, হযরত হুসাইন ও আবদুল্লাহ ইবনে জাফর (রাদিঃ) হজ্জপালনের উদ্দেশ্যে বাহির হইলেন। পথিমধ্যে রসদ ফুরাইয়া গেলে পিপাসা অনুভব করিলেন। হঠাৎ একবৃদ্ধা মহিলাকে এক নিভৃত তাঁবুতে দেখিতে পাইলেন। মহিলাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনার কাছে পান করার কিছু আছে কি? মহিলা উত্তরে বলিল হ্যাঁ, আছে। তাহারা সাওয়ারী হইতে নামিয়া আসিলেন এবং তাবুর কাছে একটি ছোট্ট বকরী দেখিতে পাইলেন, মহিলা বলিল, তোমরা বকরীটি আন এবং উহার দুধ দোহন করিয়া পান কর। তাঁহারা বকরীর দুধ দোহন করতঃ পান করিলেন। তারপর জিজ্ঞাসা করিলেন আপনার কাছে খাইবার কিছু আছে কি? মহিলা বলিল, খাইবার অন্য কিছু নাই এই বকরীটি আছে। ইহাই জবেহ করিয়া দাও আমি তোমাদের জন্য রান্না করিয়া দেই। তাহারা বকরীটি জবেহ করিয়া দিলেন। আর মহিলা উহা রান্না করিয়া দিলেন। তাঁহারা খানা পিনা করিলেন, কিছুক্ষণ আরাম করিলেন ইহাতে দুপুর অতিবাহিত হইয়া গেল। বিকালে রওয়ানা হওয়ার সময় মহিলাকে বলিলেন, আমরা কুরাইশী। হজ্জ পালনের উদ্দেশ্যে যাইতেছি। যখন হজ্জ হইতে নিরাপদে ফিরিব তখন আমাদের সহিত সাক্ষাৎ করিলে ইনশাআল্লাহ আপনার উপকার করিব। এই বলিয়া তাহারা চলিয়া গেলেন। কিছুক্ষণ পর বৃদ্ধার স্বামী আসিয়া যখন ঘটনা জানিতে পারিল বৃদ্ধার প্রতি অত্যন্ত রাগান্বিত হইয়া বলিল, তুমি চিননা জাননা এমন লোককে আমার বকরী খাওয়াইয়া দিয়াছ আর বলিতেছ তাহারা কুরাইশী। যাহাই হউক কিছু দিন পর ঐ স্বামী স্ত্রীকে কোন প্রয়োজনে মদীনায় আসিতে হইল। তাহারা উটের গোবর সংগ্রহ করতঃ উহা বিক্রয় করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিত। ঘটনাক্রমে ঐ বৃদ্ধা হযরত হাসান (রাদিঃ) -এর বাড়ীব নিকট দিয়া যাইতে ছিল। হাসান (রাঃ) ঘরের দরজায় বসা ছিলেন। বৃদ্ধাকে দেখিতেই তিনি চিনিয়া ফেলিলেন। তাড়াতাড়ি গোলামকে পাঠাইয়া বৃদ্ধাকে আনাইলেন। হাসান (রাদিঃ) বৃদ্ধাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি আমাকে চিনিতে পারিয়াছেন, বৃদ্ধা বলিল, না। হাসান (রাদিঃ) বলিলেন, আমি তো ঐ ব্যক্তি যে অমুক দিন আপনার মেহমান হইয়াছিলাম। আপনি বকরী জবেহ করিয়া আমাদের মেহমানদারী করিয়াছিলেন। বৃদ্ধা বলিল, আপনিই ঐ ব্যক্তি? তিনি বলিলেন, হ্যাঁ, হযরত হাসান (রাদিঃ) তাহাকে এক হাজার দীনার ও এক হাজার বকরী দিয়া হযরত হুসাইন (রাদিঃ) -এর কাছে পাঠাইলেন। হযরত হুসাইন

(রাদিঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, আমার ভাই হাসান কি দান করিয়াছে? বৃদ্ধা বলিল এক হাজার দীনার ও এক হাজার বকরী। অতঃপর তিনিও এক হাজার দীনার এবং এক হাজার বকরী দিয়া আব্দুল্লাহ ইবনে জাফরের নিকট পাঠাইলেন। আব্দুল্লাহ ইবনে জাফর হযরত হাসান ও হুসাইন (রাদিঃ) -এর দানের কথা জানার পর আরো দুই হাজার দীনার ও দুই হাজার বকরী দিয়া দিলেন এবং বলিলেন, আপনি যদি আগে আমার কাছে আসিতেন তবে এত পরিমান দান করিতাম যে, তাহাদের দান করা মুশকিল হইয়া যাইত। অতঃপর মহিলা চার হাজার দীনার ও চার হাজার বকরীসহ স্বামীর কাছে ফিরিয়া গেল।

আব্দুল্লাহ ইবনে আমেরের দানশীলতা

একবার আব্দুল্লাহ ইবনে আমের ইবনে কারীয মসজিদ হইতে বাহির হইয়া একাকী বাড়ীর দিকে যাইতে ছিলেন। বনি ছকীফের একটি ছেলে আসিয়া তাহার সঙ্গী হইল। তিনি ছেলেকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমার কাছে তোমার কোন প্রয়োজন আছে কি? ছেলেটি বলিল, জ্বি না, আপনি একা যাইতেছেন আপনার যাহাতে কোন অসুবিধা না হয় তাই আপনার সহিত চলিলাম। আব্দুল্লাহ ইবনে আমের তাহার হাত ধরিয়া ঘরে লইয়া গেলেন এবং তাহাকে এক হাজার দীনার দিয়া বলিলেন তুমি এই গুলি খরচ কর, তোমার অভিভাবক তোমাকে উত্তম আদব শিখাইয়াছে।

এক মাইয়্যেতের দানশীলতা

বর্ণিত আছে, একদা একটি আরব কাফেলা কোন এক দানবীর ব্যক্তির কবর যিয়ারত করিতে গেল। তাহারা সেই কবরের পার্শ্বেই রাত্রি যাপন করিল। রাত্রে তাহাদের মধ্য হইতে এক ব্যক্তি স্বপ্নে ঐ কবরবাসীকে দেখিতে পাইল। সে তাহাকে বলিতেছে, তুমি তোমার এই উটটি আমার উৎকৃষ্ট ঘোড়াটির বিনিময়ে আমার কাছে বিক্রয় করিয়া দাও। আমি ইহা দ্বারা তোমাদের মেহমানদারী করিব ঘোড়াটি আসলেও প্রসিদ্ধ ছিল। আর এই ব্যক্তির উটটিও ছিল মোটা তাজা। যাহাই হউক সে সম্মত হইল, স্বপ্নেই বেচাকেনা সম্পন্ন হইয়া গেল। এবং তখনই উটটি জবেহ করিয়া দিল। ঘুম হইতে জাগিয়া দেখিল উটের সীনা হইতে রক্ত ঝরিতেছে। সে তাড়াতাড়ি উটটি জবেহ করিয়া সাথীদের মধ্যে বন্টন করিয়া দিল। সবাই ইহা দ্বারা নিজ নিজ প্রয়োজন সারিয়া নিল। অতঃপর তাহারা ঐ জায়গা হইতে প্রস্থান করিল। দ্বিতীয় দিন পথিমধ্যে আরেক কাফেলার সহিত সাক্ষাৎ হইল। তন্মধ্যে এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, আপনাদের মধ্যে অমুক ব্যক্তি আছে কি? অর্থাৎ ঐ ব্যক্তির নাম লইয়া বলিল যে স্বপ্ন দেখিয়াছিল। সে বলিল, আমিই সেই ব্যক্তি। ঐ ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল আপনি অমুক ব্যক্তির নিকট কিছু বিক্রয় করিয়াছেন কি? সে বলিল, হ্যাঁ, স্বপ্নযোগে আমার উটটি তাহার কাছে তাহার ঘোড়ার বিনিময়ে বিক্রয় করিয়াছি। ঐ ব্যক্তি বলিল, নিন এইটি তাহার ঘোড়া, আপনি স্বপ্নে যাহাকে দেখিয়াছেন তিনি আমার পিতা। তিনি আমাকে

বলিয়াছেন, তুমি যদি আমার ছেলে হইয়া থাক তবে আমার এই ঘোড়াটি অমুক ব্যক্তিকে দিয়া দাও।

জনৈক কুরাইশী ব্যক্তির দানশীলতা

জনৈক কুরাইশী ব্যক্তি কোন এক সফর হইতে ফিরিতেছিল। পথিমধ্যে দেখিল এক আরব বেদুঈন ক্ষুধার্ত অবস্থায় রাস্তায় পড়িয়া আছে। তাহাকে দেখিয়া বলিল, আমাকে কিছু সাহায্য করিবেন কি? ঐ ব্যক্তি আপন গোলামকে বলিল, তোমার নিকট যাহা আছে তাহা এই ব্যক্তিকে দিয়া দাও। গোলাম ঐ বেদুঈনের কোলে চার হাজার দেরহাম ঢালিয়া দিল। সে দুর্বলতার কারণে দেরহাম গুলি নিয়া উঠিতে পারিতেছিলনা। সে কাঁদিতেছিল। কুরাইশী ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কাঁদিতেছ কেন? সম্ভবতঃ আমি যাহা দান করিয়াছি তাহা তোমার জন্য কম হইয়াছে। সে বলিল না, কম হয় নাই, আমি কাঁদিতেছি এই জন্য যে, মাটি আপনার এই বদান্যতাকেও গ্রাস করিয়া ফেলিবে।

আব্দুল্লাহ ইবনে আমেরের দানশীলতার অপর একটি ঘটনা

আব্দুল্লাহ ইবনে আমের খালেদ ইবনে উকবার নিকট হইতে নব্বই হাজার দেরহাম দ্বারা একটি বাড়ী খরিদ করিয়াছিলেন। রাত্রে খালেদের পরিবারের কান্না শুনিতে পাইয়া আপন পরিবারস্থ লোকজনকে জিজ্ঞাসা করিলেন তাহারা কাঁদিতেছে কেন? উত্তরে তাহারা বলিল, বাড়ীর জন্য। আব্দুল্লাহ ইবনে আমের তৎক্ষনাৎ গোলামকে ডাকিয়া বলিলেন, যাও খালেদ পরিবারকে যাইয়া বল, এই বাড়ী ও বাড়ীর মূল্য সবই তাহাদের।

ইমাম মালেক (রহঃ) -এর দানশীলতা

বর্ণিত আছে একদা খলীফা হারুনুর রশীদ ইমাম মালেক (রহঃ) -এর নিকট পাঁচশত দীনার হাদিয়া পাঠাইলেন। এই সংবাদ লইয়া ইবনে সা'দ (রহঃ) -এর কাছে পৌঁছিলে তিনি ইমাম মালেক (রহঃ) -এর নিকট একহাজার দীনার পাঠাইলেন। হারুনুর রশীদ এই সংবাদ শুনিতে পাইয়া অত্যন্ত রাগান্বিত হইলেন যে, আমি পাঠাইয়াছি পাঁচশত দীনার আর আপনি আমার প্রজা হইয়া এক হাজার দীনার পাঠাইয়াছেন? লাইছ ইবনে সা'দ বলিলেন, আমীরুল মুমিনীন। আমার দৈনিক আয় এক হাজার দীনার। আমার একদিনের আয়ের কম টাকা তাহার ন্যায় ব্যক্তিকে দিতে লজ্জা বোধ হইল।

কথিত আছে, তাঁহার উপর কখনও যাকাত ওয়াজিব হইতনা। অথচ তাঁহার দৈনিক আয় ছিল এক হাজার। আরো কথিত আছে, জনৈকা মহিলা তাঁহার নিকট মধু চাহিয়া ছিল। তিনি ঐ মহিলাকে এক মটকা মধু দিয়াছেন। তাঁহাকে বলা হইল, এই মহিলাকে আরো কম দিলেও প্রয়োজন সারিয়া যাইত। তিনি বলিলেন, মহিলা তাহার শানমত চাহিয়াছে আমি আমার নেয়ামত অনুপাতে দান করিব।

লাইছ ইবনে সা'দ (রহঃ) প্রতিদিন তিনশত ষাট জন মিসকিনকে না খাওয়ানো পর্যন্ত কথা বলিতেন না।

খাইছামা ইবনে আব্দুর রহমানের দানশীলতা

আমাশ (রহঃ) বর্ণনা করেন, একদা আমার একটি বকরী রোগাক্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। খাইছামা ইবনে আব্দুর রহমান প্রতিদিন আসিয়া ইহার খোঁজ খবর লইতেন এবং জিজ্ঞাসা করিতেন বকরীটি ঠিকমত খায় কিনা, বাচ্চারা দুধ ছাড়া কিভাবে থাকিতেছে? তিনি যখন চলিয়া যাইতেন তখন আমাকে বলিতেন, আপনার বিছানার নীচে যাহা পান নিয়া নিবেন। এইভাবে বকরী রোগমুক্ত হওয়া পর্যন্ত আমার কাছে তাঁহার পক্ষ হইতে তিনশত দীনারেরও অধিক লাভ হইয়াছিল। আমার মনে আকাঙ্খা জাগিয়াছিল, হায় বকরীটি যদি সুস্থ না হইত।

আব্দুল মালিক ইবনে মারোয়ান আসমা বিনতে খারেজাকে বলিলেন, আপনার কতিপয় চরিত্র ও গুনের সংবাদ আমার কাছে পৌঁছিয়াছে। আপনি সেইগুলি আমাকে বলুন। আসমা বলিলেন, এইগুলি আমার নিকট হইতে না শুনিয়া অন্যের নিকট হইতে শুনিলে ভাল হইত। আব্দুল মালিক কসম দিয়া বলিলেন, আপনাকেই বলিতে হইবে। আসমা বলিলেন, আমীরুল মুমিনীন। আমি আমার সাথীদের সম্মুখে পা এলাইয়া বসিনা। আমি যখন কাহারো কোন উপকার করি তখন আমার মাধ্যমে তাহার যতটুকু উপকার সাধিত হইয়াছে উহার চাইতে বড় মনে করি আমার প্রতি তাহার উপকারকে। আর কাহাকেও কিছু দান করিলে উহাকে বেশী মনে করিনা।

সাঈদ ইবনে খালেদ ও সুলাইমান ইবনে আব্দুল মালিক (রহঃ) এর দানশীলতা

সাইদ ইবনে খালেদ একদা সুলাইমান ইবনে আব্দুল মালিকের কাছে গেলেন। সাঈদ ইবনে খালেদ অত্যন্ত দানবীর ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার অভ্যাস ছিল, যদি কেহ তাঁহার নিকট কিছু চাহিত আর দেওয়ার মত কিছু না থাকিত তবে তাহাকে একটি দস্তাবিজ লিখিয়া দিতেন যে, এত টাকা আমার জিম্মায় রহিল যখন আমার হাতে টাকা আসে তখন দিয়া দিব। সুলাইমান ইবনে আব্দুল মালিক তাঁহার এই অবস্থা দেখিয়া নিম্নোক্ত রচনাটি পাঠ করিলেন,

انى سمعت مع الصباح مناديا × يامن يعين على الفتى المعوان

"আমি প্রতুষে এক ঘোষককে ঘোষণা দিতে শুনিয়াছি, কে দানবীর ও দাতাকে সাহায্য করিবে?"

অতঃপর জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনার কি প্রয়োজন আছে বলুন। সাঈদ বলিলেন, আমার কিছু ঋণ আছে। জিজ্ঞাসা করিলেন, কি পরিমান? উত্তরে বলিলেন ত্রিশ হাজার দীনার। সুলাইমান ইবনে আব্দুল মালিক বলিলেন,

আপনাকে ত্রিশ হাজার দীনার ঋণ পরিশোধ করার জন্য দেওয়া হইল আরো ত্রিশহাজার অতিরিক্তও দেওয়া হইল।

কাইস ইবনে সাদ (রহঃ) -এর দানশীলতা

বর্ণিত আছে, একদা হযরত কাইস ইবনে সা'দ অসুস্থ হইলেন। তাহার বন্ধু বান্ধব তাঁহাকে দেখার জন্য আসিতে দেরি করিলেন; তাঁহাকে বলা হইল যে, তাহারা যেহেতু আপনার কাছে ঋণী তাই লজ্জায় আসিতেছেনা। তিনি বলিলেন, আল্লাহ তায়ালা ঐ মালকে অপমানিত করুন। যাহার কারণে আমার ভাইয়েরা আমাকে দেখার জন্য আসিতে পারিতেছেনা। অতঃপর তিনি এক ব্যক্তির মাধ্যমে ঘোষণা দিয়া দিলেন যে, যাহার কাছে কাইস ইবনে সা'দ -এর ঋন আছে, সে আজ হইতে ঋণ মুক্ত। বর্ণিত আছে, ঐ দিনই বিকালে দর্শনার্থীদের এত ভিড় হইয়া ছিল যে তাঁহার ঘরের সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল।

আশআছ ইবনে কাইস (রহঃ) -এর দানশীলতা

আবু ইসহাক বলেন, আমি একবার একজন পাওনাদারের তালাসে কুফায় আসআছ ইবনে কাইছের মসজিদে নামায আদায় করিলাম। নামায শেষ করার পর এক ব্যক্তি আসিয়া আমার সম্মুখে একজোড়া কাপড় ও একজোড়া জুতা রাখিয়া দিল। আমি বলিলাম, আমি তো এই মসজিদের স্থায়ী মুসল্লী নহি। উপস্থিত লোকজন বলিল, আশআছ ইবনে কাইছ গতরাত্রে আসিয়া ছিলেন। তিনি বলিয়াছেন, যে কেহ এই মসজিদে নামায আদায় করে তাহাকে এক জোড়া কাপড় ও এক জোড়া জুতা দান করিবে।

জনৈক মাইয়্যেতের দানশীলতার ঘটনা

আবু সাঈদ নিশাপুরী বলেন, আমি মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ আল হাফেজের নিকট শুনিয়াছি, শাফিঈ যিনি মক্কায় খানায়ে কাবার খাদেম ছিলেন বর্ণনা করেন, মিশরে এক ব্যক্তি ছিল, সে ফকিরদের জন্য মানুষের নিকট হইতে চাঁদা সংগ্রহ করিয়া দিত। একবার এক কাফিরের একটি সন্তান জন্মগ্রহণ করিল। সে আসিয়া ঐ ব্যক্তিকে বলিল, আমার একটি সন্তান জন্ম গ্রহণ করিয়াছে। তাহার ভরণ পোষনের জন্য আমার কাছে কিছুই নাই। সে তাহাকে লইয়া বহু লোকের কাছে গেল কিন্তু ঘটনাক্রমে কাহারো কাছে কিছু পাইলনা। অবশেষে এক ব্যক্তির কবরের কাছে আসিয়া বলিল, ভাই। তোমার প্রতি আল্লাহ রহমত বর্ষণ করুন। আপনি জীবদ্দশায় মানুষকে খুব দান খয়রাত করিয়াছেন। আজ আমি বহু লোকের কাছে ঘুরিয়াছি। তাহাদের কাছে একটি নবজাত শিশুর জন্য কিছু পয়সা চাহিযাছি কিন্তু কেহই কোন উত্তর দেয় নাই। ইহার পর সে নিজেই একটি দীনার বাহির করিল এবং দুই ভাগ করিয়া এক ভাগ নিজের কাছে রাখিয়া দিল আরেক ভাগ নবজাত শিশুর পিতাকে দিয়া বলিল, ইহা তোমাকে করয স্বরূপ দিলাম, তোমার হাতে যখন পয়সা হয় পরিশোধ করিয়া দিবে। ঐ ব্যক্তি দীনারের টুকরা

লইয়া চলিয়া গেল এবং প্রয়োজনীয় কাজ সমাধা করিল। এই দিকে চাঁদা সংগ্রহকারী ব্যক্তি যে কবরবাসীকে সম্বোধন করিয়া কথা বলিয়াছিল তাহাকে স্বপ্নে দেখিল। কবরবাসী তাহাকে বলিতেছে, আমি তোমার সমস্ত কথা শুনিয়াছি তবে উত্তর দেওয়ার অনুমতি ছিল না তাই উত্তর দিতে পারি নাই। তবে তুমি আমার বাড়ীতে যাইয়া আমার সন্তানদিগকে বল তাহারা যেন চুলার জায়গাটি খনন করে। উহার নীচে একটি মশক রক্ষিত আছে। উহাতে পাঁচশত দীনার রহিয়াছে। ঐ গুলি বাহির করিয়া ঐ নবজাত শিশুর পিতার কাছে লইয়া যাও। ভোরে ঐ ব্যক্তি কবরবাসীর বাড়ীতে গেল এবং তাহার সন্তানদের কাছে সমস্ত ঘটনা খুলিয়া বলিল, তাহারা বলিল, ঠিক আছে আপনি বসুন। তাহারা ঐ জায়গা খনন করিয়া দীনার গুলি বাহির করিল এবং তাহার সম্মুখে আনিয়া রাখিল, সে বলিল এই দীনারের মালিক আপনারা, আমার স্বপ্নেরকি ধর্তব্য আছে? তাহারা বলিল, তিনি যদি মৃত্যুর পর দানশীলতার কাজ করিতে পারেন তবে আমরা জীবিত থাকিয়া কি তাহা করিতে পারিব না? তাহাদের পিড়াপিড়িতে ঐ ব্যক্তি দীনার গুলি নবজাত শিশুর পিতার কাছে লইয়া গেল এবং বৃত্তান্ত বর্ণনা করিল। সে তন্মধ্য হইতে একটি দীনার লইয়া দুই ভাগ করিল। এক ভাগ দ্বারা তাহার করজ পরিশোধ করিল আরেক ভাগ নিজের কাছে রাখিয়া দিল এবং বলিল ইহাই আমার জন্য যাথেষ্ট অবশিষ্ট দীনার আপনি ফকির মিসকিন দিগকে সদকা করিয়া দিন।

ঘটনা বর্ণনাকারী আবু সাঈদ বলেন, আমি জানিনা তাহাদের মধ্যে কে সব চাইতে দানবীর।

ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) -এর যুগের জনৈক দানশীলের ঘটনা

বর্ণিত আছে, ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) মিশরে, মৃত্যুরোগে আক্রান্ত অবস্থায় আত্মীয়-স্বজনকে বলিলেন, আমার মৃত্যু হইলে অমুক ব্যক্তিকে আমাকে গোসল দিতে বলিবে। তাঁহার ইন্তিকালের সংবাদ পাইয়া ঐ ব্যক্তি উপস্থিত হইল এবং বলিল, তাঁহার ডাইরীটি আমাকে দিন। সে ডাইরী খুলিয়া দেখিল ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) -এর কাছে বিভিন্ন লোকের সত্তর হাজার দেরহাম ঋণ রহিয়াছে। ঐ ব্যক্তি সমস্ত ঋণ নিজ দায়িত্বে নিয়া গেল এবং পরিশোধ করিয়া দিল আর বলিল, আমার গোসল দেওয়ার অর্থ ইহাই[১] আবু সাঈদ হারকুশী নীশাপুরী বলেন, আমি যখন মিশরে গেলাম তখন ঐ ব্যক্তিকে তালাশ করিলাম। মানুষের কাছে জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা পরিচয় বলিয়া দিল। আমি তাহার বাড়ীতে গেলাম, তাহার সন্তান সন্তুতির মধ্যে তাহার বরকতে শুভলক্ষণ পরিলক্ষিত ও প্রস্ফুটিত হইতে ছিল, ইহার প্রমাণও কোরআনে কারীম হইতে বুঝে আসিয়া গেল-

وَكَانَ اَبُوْهُمَا صَالِحًا

"আর তাহাদের পিতা ছিল নেককার।"

টীকা -(১) অর্থাৎ ঋণ মুক্ত করা।

ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) -এর দানশীলতা

ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) বলেন, আমি হাম্মাদ ইবনে আবু সুলাইমানকে এইজন্য ভালবাসি যে, একদিন তিনি গাধায় আরোহন করিয়া কোথাও যাইতে ছিলেন। গাধাকে দ্রুত গতিতে চালানোর কারণে তাঁহার কুর্তার একটি বোতাম খুলিয়া যায়। পথিমধ্যে জনৈক দরজীকে দেখিয়া তিনি গাধা হইতে নামিতে চাহিলেন। দরজী আগাইয়া আসিয়া বলিল, আপনার নামিতে হইবে না আমিই ঠিক করিয়া দিতেছি। হাম্মাদ দরজীর কাজে খুশী হইয়া তাহাকে একটি থলি বাহির করিয়া দিলেন যাহার মধ্যে দশটি দীনার ছিল। অতঃপর দরজীর কাছে ওযর জানাইলেন যে, ইহা কম হইয়া গিয়াছে আমার কাছে আর নাই বিধায় দিতে পারিলাম না। ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) তখন নিজের জন্য নিম্নোক্ত কবিতা আবৃত্তি করেন— (১)

يا لهف قلبى على مال اجود به × على المقلين من اهل المروات

ان اعتذرى الى من جاء يألنى × ماليس عندى لمن احدى المصيبات

আফসোস্। আমার যদি মাল থাকিত তবে মানবতাশীল ও সম্ভ্রান্ত গরীবদের জন্য খরচ করিতাম।

কেহ যদি আমার কাছে আসিয়া কিছু চায় আর আমাকে ওযর ও আপারগতা প্রকাশ করিতে হয় যে আমার কাছে কিছু নাই তবে ইহা আমার জন্য বিরাট একটি মুসীবত।

রবী ইবনে সুলাইমান বর্ণনা করেন, একবার এক ব্যক্তি আসিয়া ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) -এর সাওয়ারীর রিকাব ধরিল। ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) বলিলেন, হে রবী। তাহাকে চারটি দীনার দিয়া দাও আর তাহাকে বলিয়া দাও এখন আর কিছু নাই। হুমাইদী বর্ণনা করেন, একবার ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) সানআ হইতে মক্কায় আগমন করিলেন এবং সঙ্গে দশহাজার দীনার লইয়া আসিলেন। অতঃপর মক্কার বাহিরে একটি তাঁবু খাটাইলেন এবং দীনারগুলি একটি কাপড়ে ছড়াইয়া দিলেন। ইহার পর যে কেহ তাঁহার কাছে আসে তাহাকে একমুষ্ঠি করিয়া দীনার দিতে থাকেন। এইভাবে যোহরের নামায পর্যন্ত সমস্ত দীনার দান করিয়া শেষ করিয়া দেন। আবু ছাউর বর্ণনা করেন, একবার ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) মক্কায় গমনের ইচ্ছা করিলেন। তাঁহার সহিত কিছু মাল ছিল। তিনি তাঁহার দানশীলতার কারণে পয়সা হাতে রাখিতেন না। আমি বলিলাম, আপনি যদি এই টাকা দ্বারা

টীকা- (১) ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) কাব্য রচনায় যথেষ্ট দক্ষতা ছিল কিন্তু তিনি ইহার প্রতি আকৃষ্ট হন নাই। তিনি বলেন, কাব্য রচনা যদি আলেমদের জন্য দোষণীয় না হইত তবে আমি কবি লবীদের চাইতেও বড় কবি হইতাম। "আমার মনে বহু কাজ করিতে চায় কিন্তু অর্থে সংকুলান হয় না। আমার মন কখনও কার্পন্যের আনুগত্য করেনা কিন্তু আমার অর্থ ও সামর্থ্য এতটুকু লাভ হয় না যে দান করিব।"

মক্কায় কিছু জায়গা খরিদ করিয়া লইতেন তবে আপনার এবং সন্তানদের প্রয়োজনে আসিত। ইহার পর তিনি বাহির হইয়া গেলেন এবং কিছুক্ষণ পর ফিরিয়া আসিলেন। তখন তাঁহার হাতে কোন পয়সা দেখিতে পাইলাম না। আসিয়া বলিলেন, মক্কায় ঘুরাফেরা করিয়া দেখিয়াছি। মক্কায় অর্ধিকাংশ জায়গা ওয়াকফ। আর ওয়াকফ ক্রয় করা জায়েয নহে। তবে মিনাতে একটি পান্থশালা তৈরি করিয়া আসিয়াছি। হাজী ভাইয়েরা উহাতে অবস্থান করিবেন। অতঃপর তিনি একটি কবিতা আবৃত্তি করিলেন যাহার অনুবাদ নিম্নে প্রদত্ব হইল -

মুহাম্মদ ইবনে আব্বাস মুহাল্লাবী বর্ণনা করেন, আমার পিতা একদা খলীফা মামূনের কাছে গেলেন। মামূন তাহাকে একলক্ষ দেরহাম হাদিয়া দিলেন। তিনি খলীফার দরবার হইতে বাহির হইয়াই সমস্ত দেরহাম দান করিয়া দেন। এই সংবাদ মামুনের কাছে পৌঁছিল। পুনরায় যখন তিনি মামূনের কাছে গেলেন তখন মামূন তাহাকে গঞ্জনা করিলেন। তিনি খলীফাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, আমীরুল মুমেনীন হাতে যে মাল আছে উহা দান না করা রাব্বুল আলামীনের সম্পর্কে অসমীচীন ধারণা পোষণের শামিল। ইহা শুনিয়া খালীফা মামূন তাহাকে আরো একলক্ষ দেরহাম দিয়া দেন।

এক ব্যক্তি সাঈদ ইবনে সাদ-এর নিকট আসিয়া কিছু চাহিল তিনি তাহাকে একলক্ষ দেরহাম দিয়া দেয়ার নির্দেশ দিলেন। দেরহাম পাইয়া সে কাঁদিতে শুরু করিল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কাঁদিতেছ কেন? উত্তরে বলিল, আমি এই জন্য কাঁদিতেছি যে, মাটি আপনার মত দানবীরকেও গ্রাস করিবে। সাঈদ ইবনে আস এই কথা শুনিয়া তাহাকে আরো এক লক্ষ দেরহাম দানের নির্দেশ দিলেন।

ইব্রাহীম ইবনে শাকলা (রহঃ) -এর দানশীলতা

একবার কবি আবু তাম্মাম ইব্রাহীম ইবনে শাকলার প্রশংসায় একটি কবিতা লিখিল। ইব্রাহীম তখন অসুস্থ ছিলেন। আবু তাম্মামের প্রশংসা গ্রহণ করিলেন এবং দ্বার রক্ষীকে বলিলেন তাহাকে উপঢৌকন দিয়া দাও। আর এই কথা বলিয়া দাও যে, আমি সুস্থ হইলে ইহার পূর্ণ প্রতিদান দিব। আবু তাম্মাম দুই মাস কাল অপেক্ষা করিল। অবশেষে বিরক্ত হইয়া আরেক কবিতা লিখিয়া পাঠাইল যাহার অনুবাদ নিম্নে প্রদত্ব হইল -

"আমার প্রশংসাপত্র গ্রহণ করা এবং উহার প্রতিদান সাথে সাথে না দেওয়া হারাম যেমনিভাবে সোনা রূপা বাকি বেচা কেনা হারাম।"

এই কবিতা ইব্রাহীমের কাছে পৌঁছিলে দ্বাররক্ষীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, সে কত দিন যাবৎ অপেক্ষা করিতেছে? উত্তরে বলিল দুই মাস যাবৎ। ইব্রাহীম বলিলেন, তাহাকে ত্রিশ হাজার দেরহাম দিয়া দাও আর আমার কাছে দোয়াত কলম আন। অতঃপর তিনি পদ্যে আবু তাম্মামের প্রতি লিখিয়া পাঠাইলেন-

"তুমি তাড়াহুড়া করিয়া ফেলিয়াছ। দেরি করিলে কম পাইতে না বরং বেশীই পাইতে। অতএব তুমি এই কম পরিমানই গ্রহণ করতঃ মনে করিয়া লও তুমিও কোন প্রশংসা কর নাই আর আমিও তোমাকে কিছু দান করি নাই।"

হযরত উছমান (রাদিঃ) হযরত তালহা (রাদিঃ) -এর দানশীলতা

হযরত উছমান (রাদিঃ) হযরত তালহা (রাদিঃ) -এর কাছে পঞ্চাশ হাজার দেরহাম পাইতেন। একদিন হযরত উছমান (রাদিঃ) মসজিদের দিকে চলিলেন। হযরত তালহা (রাদিঃ) তাহাকে দেখিয়া বলিলেন, আপনার টাকা যোগাড় হইয়াছে নিয়া নিন। উছমান (রাদিঃ) বলিলেন, আবু মুহাম্মদ। এই টাকা আপনার দানশীলতার কাজের সহায়তা স্বরূপ আপনাকে দিয়া দিলাম। সা'দ বিনতে আউফ বর্ণনা করেন, আমি একদা তালহা (রাদিঃ) -এর কাছে গেলাম তাঁহাকে অত্যন্ত চিন্তিত অবস্থায় দেখিতে পাইলাম। কারন জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, আমার কাছে কিছু মাল আসিয়া গিয়াছে উহার জন্য চিন্তিত। আমি বলিলাম, চিন্তার কি কারণ? আপনি গোত্রের লোকজনকে ডাকিয়া তাহাদের মধ্যে বন্টন করিয়া দিন। তৎক্ষনাৎ খাদেমকে বলিলেন, যাও লোকজনকে ডাক। খাদেম লোকজনকে ডাকিয়া আনিল। তিনি সমস্ত মাল তাহাদিগকে বন্টন করিয়া দিয়া দেন। আমি খাদেমকে জিজ্ঞাসা করিলাম কি পরিমাণ মাল ছিল? সে বলিল, চার লক্ষ দেরহাম ছিল।

জনৈক বেদুঈনকে তালহা (রাদিঃ) -এর বিরাট ভুখন্ডের মূল্য দান

একবার জনৈক বেদুঈন হযরত তালহা (রাদিঃ)-এর কাছে আসিল এবং আত্মীয়তার পরিচয় দিয়া কিছু সাহায্য চাহিল তালহা (রাদিঃ) বলিলেন, ইতিপূর্বে আত্মীয়তার পরিচয় দিয়া আর কেহ সাহায্য প্রার্থনা করে নাই। যাহাই হউক আমার কিছু জমি আছে উছমান (রাদিঃ) উহা তিন লক্ষ দেরহাম দ্বারা খরিদ করিতে চান। তুমি ইচ্ছা করিলে ঐ জমি নিয়া নিতে পার অথবা আমি উছমান (রাদিঃ)-এর কাছে বিক্রয় করিয়া উহার মূল্য তোমাকে দিয়া দিতে পারি। সে বলিল, আমাকে মুল্যই দিয়া দিন। হযরত তালহা (রাদিঃ) জমি বিক্রয় করিয়া উহার মুল্য তাহাকে দিয়া দেন।

একবার হযরত আলী (রাদিঃ) খুব কাঁদিতেছিলেন। কারণ জিজ্ঞাসা করা হইলে বলিলেন, আজ সাত দিন যাবৎ আমার কাছে কোন মেহমান আসিতেছে না, না জানি আল্লাহ তায়ালার কাছে আমি তুচ্ছ হইয়া গিয়াছি।

জনৈক ব্যক্তির দানের পর ক্রন্দন

একব্যক্তি তাহার বন্ধুর বাড়ীতে আসিয়া দরজায় করাঘাত করিল। তাহার বন্ধু জিজ্ঞাসা করিল কি প্রয়োজনে আসিয়াছেন? সে বলিল, আমি চারশত দেরহাম ঋনগ্রস্ত হইয়া গিয়াছি। ঐ ব্যক্তি তাহাকে চার হাজার দেরহাম দিয়া দিল। ইহার পর ঘরে আসিয়া কাঁদিতে শুরু করিল। তাহার স্ত্রী বলিল, টাকা

দেওয়াতে যদি কষ্ট পাইয়া থাকেন তাহা হইলে টাকা দিলেন কেন? সে উত্তরে বলিল, আমি টাকার জন্য কাঁদিতেছিনা বরং এই জন্য কাঁদিতেছি যে, পূর্ব হইতেই তাঁহার খোঁজ খবর লইলাম না যাহার কারণে তাহাকে আমার কাছে আসিতে হইয়াছে।

আল্লাহ তায়ালা এই সমস্ত উন্নত গুনাবলীর অধিকারী ব্যক্তির প্রতি রহমত বর্ষন করুন।

কৃপণতার নিন্দা

কৃপণতার নিন্দা সম্পর্কিত কোরআনে কারীমের আয়াত

কৃপণতার নিন্দায় কোরআনে কারীমের বিভিন্ন জায়গায় আল্লাহ তায়ালার ইরশাদ রহিয়াছে। যেমন -

وَمَنْ يُّوْقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ

"আর যাহারা আপন নফসের কৃপণতা হইতে মুক্তি পাইয়াছে তাহারাই কৃতকার্য।"

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ بِمَا اٰتَاهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُوْنَ مَا بَخِلُوْا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ -

"যাহারা আল্লাহ প্রদত্ত অনুগ্রহের ব্যাপারে কৃপণতা করে তাহারা যেন এই ধারণা না করে যে, ইহা তাহাদের জন্য মঙ্গলজনক বরং ইহা তাহাদের জন্য অমঙ্গলজনক। অচিরেই কিয়ামতের দিন যে জিনিসের ব্যাপারে কৃপণতা করিয়াছিল উহা তাহাদের গলার তবক হইবে।"

اَلَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ وَيَأْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُوْنَ مَا اٰتَاهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ -

"যাহারা কৃপণতা করে এবং মানুষকেও কৃপণতা শিখায় আর আল্লাহ প্রদত্ব অনুগ্রহ গোপন রাখে।"

কৃপণতার নিন্দা সম্পর্কিত হাদীছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

অনুরূপভাবে কৃপণতার নিন্দা সম্পর্কে বহু হাদীছও বর্ণিত রহিয়াছে। যেমন -

কৃপণতা রক্তপাতের কারণ

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলিয়াছেন, তোমরা কৃপণতা পরিহার কর। কেননা কৃপণতাই তোমাদের পূর্ববর্তীদিগকে ধ্বংস করিয়াছে। ইহা তাহাদিগকে রক্তপাত ঘটানো এবং হারামকে হালাল মনে করার উপর উদ্বুদ্ধ করিয়াছে। অপর হাদীছে আছে, তোমরা কৃপণতা পরিহার কর, কেননা ইহাই পূর্ববর্তী লোকদিগকে খুন খারাবী, হারামকে হালাল মনে করা এবং আত্মীয়তা

ছিন্ন করার কাজে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, কৃপণ, প্রতারক, খেয়ানতকারী ও দুশ্চরিত্রবান ব্যক্তি জান্নাতে যাইবে না। কোন কোন হাদীছে অত্যাচারী ও উপকার জ্ঞাপক শব্দের ও উল্লেখ রহিয়াছে। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, তিনটি বিষয় ধ্বংসাত্মক, এমন কৃপণতা যাহার আনুগত্য করা হয়, কুপ্রবৃত্তি যাহার নির্দেশমত চলা হয় ও [নিজের বড়াই।

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, আল্লাহ তায়ালা তিন প্রকার ব্যক্তিকে অপছন্দ করেন। বৃদ্ধ ব্যাভিচারী, উপকার জ্ঞাপক কৃপণ ও অহংকারী ফকির।

বখীল ও দানশীলের উদাহরণ

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, দাতা ও কৃপণের উদাহরণ হইল এমন দুই ব্যক্তি যাহাদের পরণে লৌহ বর্ম বুক হইতে গলদেশ পর্যন্ত, দাতা যখনই কিছু দান করিতে চায় তাহার সেই লৌহ বর্ম প্রশস্ত হইয়া যায় এবং হাত খুলিয়া যায় এমনকি উহা হাতের অঙ্গুলি পর্যন্ত চলিয়া যায়। আর কৃপনের অবস্থা হইল এই যে, যখনই দানের প্রশ্ন আসে তখন তাহার লৌহবর্ম সংকীর্ণ হইতে থাকে এবং কড়িগুলি স্ব স্ব স্থানে শক্ত হইয়া বসিয়া যায়। অতএব তাহার হাত গলায় লাগিয়া যায় এবং গলা চিপিয়া যাইতে চায়। তখন সে উহা প্রশস্ত করিতে চায় কিন্তু প্রশস্ত হয়না।

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, দুইটি চরিত্র মুমেনের মধ্যে হইতে পারে না। কৃপণতা ও মন্দ চরিত্র।

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এক হাদীছে আল্লাহর কাছে দোয়া করিয়াছেন, হে আল্লাহ। আপনার কাছে কৃপণতা হইতে পানাহ চাই, কাপুরুষতা হইতে পানাহ চাই এবং অতি বার্দ্ধক্য হইতেও পানাহ চাই।

কৃপণতা আত্মীয়তা ছিন্নের কারণ

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, তোমরা জুলুম পরিহার কর কেননা জুলুম কিয়ামতের দিন অন্ধকারে পরিণত হইবে, তোমরা কটুক্তি পরিহার কর। কেননা আল্লাহ তায়ালা কটুক্তিকারীকে পছন্দ করেন না। চাই ইহা প্রভাবগত কারণে হউক অথবা লৌকিকতা বশতঃ হউক। তোমরা কৃপণতা পরিহার কর। কেননা এই কৃপণতাই পূর্ববর্তী লোকদিগকে মিথ্যা বলার নির্দেশ দিয়াছে অতএব তাহারা মিথ্যা বলিয়াছে, তাহাদিগকে জুলুমের নির্দেশ দিয়াছে অতএব তাহারা জুলুম করিয়াছে, তাহাদিগকে আত্মীয়তা ছিন্ন করার, নির্দেশ দিয়াছে অতএব তাহারা আত্মীয়তা ছিন্ন করিয়াছে।

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, মানুষের মধ্যে সব

চাইতে খারাপ বিষয় হইল অতি লোভ বা কৃপণতা আর অতি কাপুরুষতা।

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) -এর যুগে এক ব্যক্তি শহীদ হইয়াছিল। তাহার আত্মীয় স্বজনের মধ্য হইতে কোন এক মহিলা কাঁদিতেছিল আর বলিতেছিল, হায় আমার শহীদ। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলিলেন, সে যে শহীদ হইয়াছে ইহা তুমি কিরূপে জান? হইতে পারে সে অনর্থক কথা বলিয়াছে অথবা যে জিনিস কমিবেনা উহার ব্যাপারে কৃপণতা করিয়াছে।

কৃপণতা ঘৃণিত বিষয়

জুবাইর ইবনে মুতইম (রাদিঃ) বর্ণনা করেন, আমরা খায়বর হইতে প্রত্যাবর্তনকালে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সহিত যাইতে ছিলাম। হঠাৎ কতিপয় আরব বেদুঈন আসিয়া রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে জড়াইয়া ধরিল এবং বলিল আমাদিগকে কিছু দান করিতে হইবে। এমনকি তাহারা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে এক বাবুল গাছের সহিত নিয়া ঠেকাইল। তাঁহার চাদর বাবুল গাছে আটকাইয়া গেল। তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলিলেন, আমার চাদরটি দিয়া দাও। আল্লাহর কসম, এই প্রান্তরের বাবুল বৃক্ষ পরিমাণ মালও যদি আমার থাকিত তবে আমি সমস্ত মাল তোমাদিগকে দান করিয়া দিতাম তারপরও তোমরা আমাকে কৃপণ বা মিথ্যুক বা কাপুরুষ পাইতেনা।

হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাদিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) একবার কতক লোককে কিছু মাল দান করিলেন। আমি বলিলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ। অন্য লোক তাহাদের তুলনায় অধিক হকদার ছিল। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলিলেন, আমি ইহাদিগকে এই জন্য দান করিয়াছি যে, ইহারা হয়ত আমার কাছে কটুক্তির মাধ্যমে চাহিবে অথবা আমাকে কৃপণ মনে করিবে অথচ আমি কৃপণ নহি।

আবু সাঈদ খুদরী (রাদিঃ) বর্ণনা করেন, একবার দুইজন লোক রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছে আসিয়া উট খরিদ করার জন্য টাকা চাহিল। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাহাদিগকে দুইটি দীনার দিয়া দিলেন। তাহারা চলিয়া গেল। পথে তাহাদের সহিত হযরত ওমর (রাদিঃ)-এর সাক্ষাৎ হইল। তাহারা হযরত ওমর (রাদিঃ)-এর কাছে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর খুব প্রশংসা করিল এবং উপকারের শোকরিয়া জ্ঞাপন করিল। হযরত ওমর (রাদিঃ) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট আসিয়া ইহা জানাইলে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলিলেন, সে তো সামান্য পাইয়াও প্রশংসা ও শোকরিয়া জ্ঞাপন করিয়াছে কিন্তু অমুক ব্যক্তিকে দশ হইতে একশত দীনার পর্যন্ত দান করিয়াছি তথাপি সে শোকরিয়া জ্ঞাপন করে নাই। কেহ আসিয়া আমার কাছে কিছু চায়।

যখন সে কাঙ্খিত বস্তু বগলের নীচে করিয়া লইয়া যায়। মূলতঃ সে বগলের নীচে করিয়া আগুন লইয়া যায়। হযরত ওমর (রাদিঃ) বলিলেন, যদি আগুনই হইয়া থাকে তবে তাহাদিগকে এই আগুন দেন কেন? রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলিলেন, তাহারা তো চাওয়া বাদ দিবেনা আর আল্লাহ তায়ালা আমার জন্য কৃপণতা অপছন্দ করেন।

দানশীলতা এমন বৃক্ষ যাহার সম্পর্ক জান্নাতের সহিত

ইবনে আব্বাস (রাদিঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, দানশীলতা আল্লাহর গুন বিশেষ। অতএব তোমরা দানশীলতা অবলম্বন কর আল্লাহ তায়ালাও তোমাদিগকে দান করিবেন। জানিয়া রাখ আল্লাহ তায়ালা দানশীলতাকে একটি মানুষরূপে সৃষ্টি করতঃ উহার মাথা তূবা বৃক্ষের (বেহেস্তের বৃক্ষ) মূলের সহিত সংযুক্ত করিয়া দিয়াছেন, আর ইহার শাখা সমূহ সিদরাতুল মুনতাহার শাখা সমূহের সহিত সংযুক্ত করিয়া দিয়াছেন, আর কিছু শাখা দুনিয়াতে ঝুলাইয়া রাখিয়াছেন। যে ব্যক্তি ঐ সমস্ত শাখার কোন একটি ধারণ করিবে ঐ শাখা তাহাকে জান্নাতে পৌছাইয়া দিবে। জানিয়া রাখ দানশীলতা ঈমানের অন্তর্ভূক্ত। আর ঈমান জান্নাতে যাইবে। আর আল্লাহ তায়ালা কৃপণতা সৃষ্টি করিয়াছেন আপন গোস্বা হইতে। ইহার মাথাকে যাক্কুম বৃক্ষের মূলের সহিত সংযুক্ত করিয়া দিয়াছেন, আর ইহার কিছু শাখা দুনিয়ার দিকে ঝুলাইয়া রাখিয়াছেন। যে ব্যক্তি ঐ সমস্ত শাখার কোন একটি ধারণ করিবে ঐ শাখা তাহাকে জাহান্নামে পৌছাইয়া দিবে। জানিয়া রাখ কৃপণতা হইল কুফরের অন্তর্ভূক্ত আর কুফর জাহান্নামে যাইবে। অপর হাদীছে আছে দানশীলতা এমন এক বৃক্ষ যাহা জান্নাতে উৎপন্ন হয়। অতএব জান্নাতে দানশীল ব্যক্তিই যাইবে। আর কৃপণতা এমন এক বৃক্ষ যাহা জাহান্নামে উৎপন্ন হয়। অতএব জাহান্নামে কৃপণ ব্যক্তিই যাইবে।

কৃপণতা মারাত্মক ব্যাধি

আবু হুরাইরা (রাদিঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বনি লাহইয়ানকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে বনি লাহইয়ান! তোমাদের সরদার কে? তাহারা উত্তরে বলিল, জাদ ইবনে কাইস, তবে সে কৃপণ লোক। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলিলেন, কৃপণতার চাইতে বড় ব্যাধি আর কি হইতে পারে? তোমাদের সরদার আমর ইবনে জামূহ। অপর হাদীছে আছে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা জাদ ইবনে কাইসকে কেন সরদার মান? তাহারা বলিল, সে বিরাট সম্পদশালী। তবে সে কৃপণ। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলিলেন, কৃপণতার চাইতে বড় ব্যাধি আর কি হইতে পারে? সে তোমাদের সরদার নহে। তাহারা জিজ্ঞাসা করিল তবে আমাদের সরদার কে? রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলিলেন, তোমাদের সরদার বিশর ইবনে বারা।

কৃপণতা আল্লাহর কাছে অতি অপছন্দনীয় গুণ

হযরত আলী (রাদিঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, আল্লাহ ঐ ব্যক্তিকে অপছন্দ করেন যে জীবদ্দশায় কৃপণ আর মৃত্যুকালে দানশীল। তিনি অপর হাদীছে বর্ণনা করেন। কৃপণতা ও ঈমান কোন বান্দার অন্তরে একত্র হইতে পারে না। অপর হাদিছে আছে, কৃপনতা ও মন্দ চরিত্র এই দুইটি স্বভাব কোন মুমেনের মধ্যে হইতে পারে না।

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, কোন মুমেনের জন্য কৃপণ বা কাপুরুষ হওয়া উচিৎ নহে। অপর হাদীছে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, মানুষে বলে, জালেমের তুলনায় কৃপণ বেশী মাযূর(১) অথচ আল্লাহর কাছে কৃপণতার চাইতে বড় কোন জুলুম নাই। আল্লাহ তায়ালা আপন ইজ্জত, মর্যাদা ও মহত্বের কসম করিয়া বলেন, কৃপণ জান্নাতে প্রবেশ করিবে না।

বখীল জান্নাত হইতে মাহরুম থাকিবে

বর্নিত আছে, একদা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কা'বা শরীফের তাওয়াফ করিতে ছিলেন। হঠাৎ এক ব্যক্তিকে দেখিলেন সে কাবা ঘরের চাদর জড়াইয়া ধরিয়া বলিতেছে, হে আল্লাহ! এই ঘরের সম্মানার্থে আমার গোনাহ মাফ করিয়া দিন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলিলেন, তোমার গোনাহটা কি বলত। সে বলিল, আমার গোনাহ বর্ণনাতীত। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জিজ্ঞাসা করিলেন তোমার গোনাহ বড় নাকি যমীন বড়? সে বলিল, ইয়া রাসূলুল্লাহ। আমার গোনাহ বড়, তারপর জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার গোনাহ বড় নাকি পাহাড় বড়? সে বলিল, আমার গোনাহ বড়। তারপর জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার গোনাহ বড় নাকি সাগর বড়? সে বলিল ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার গোনাহ বড়। তারপর জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার গোনাহ বড় নাকি আসমান বড়? সে বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার গোনাহ বড়। তারপর জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার গোনাহ বড়া নাকি আরশ বড়? সে বলিল, ইয়া রাসূলুল্লাহ আমার গোনাহই বড়। তারপর জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার গোনাহ বড় নাকি আল্লাহ বড়? এই বার সে উত্তরে বলিল, আল্লাহ তায়ালা সর্ব মহান ও সর্বশ্রেষ্ঠ। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলিলেন, তোমার গোনাহটা কি আমাকে বল। সে বলিল, ইয়া রাসূলুল্লাহ। আমি ধনসম্পদের অধিকারী। আমার কাছে যখন কোন ভিক্ষুক আসিয়া কিছু চায় তখন মনে হয় যেন সে আমার কাছে আগুন নিয়া আসিয়াছে। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উহার কথা শুনিয়া বলিলেন, তুমি আমার নিকট হইতে সর, তোমার আগুন দ্বারা আমাকে জালাইবে না। ঐ সত্তার কসম যিনি আমাকে হেদায়েতও মর্যাদা দিয়া পাঠাইয়াছেন, তুমি যদি মাকামে ইব্রাহীম ও হাজরে আসওয়াদের মধ্যবর্তী পবিত্র জায়গায় দুই হাজার বৎসর পর্যন্ত নামায আদায় কর আর

টীকা - (১) অর্থাৎ কৃপনের অপরাধ তুলনামূলত হালকা।

কাঁদিতে কাঁদিতে অশ্রু দ্বারা নদী প্রবাহিত করিয়া দাও এবং সমস্ত গাছ-পালা ভিজাইয়া ফেল অতঃপর কৃপণ অবস্থায় তোমার মৃত্যু ঘটে তবে আল্লাহ তায়ালা তোমাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করিবেন। তুমি কি জাননা যে, কৃপণতা কুফর আর কুফর জাহান্নামে যাইবে। তুমি কি আল্লাহ তায়ালার এই ইরশাদ শোন নাই -

وَمَنْ يَّبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ ـ

"আর যে দেয় না সে নিজেকেই দেয় না"

বখীল জান্নাত হইতে মাহরুম থাকিবে

হযরত ইবনে আব্বাস (রাদিঃ) বলেন, আল্লাহ তায়ালা জান্নাতে আদন সৃষ্টি করার পর তাহাকে নির্দেশ দিলেন, তুমি সুসজ্জিত হও। সে সুসজ্জিত হইল। তারপর নির্দেশ দিলেন, তুমি আপন নহর সমূহ প্রকাশ কর। সে সালসাবীল কাফুর ও তাসনীম নির্ঝর সমূহ প্রকাশ করিল। অতঃপর ঐগুলি হইতে জান্নাতে শরাব, মধু ও দুধের নহর প্রবাহিত হইয়া গেল। তারপর নির্দেশ দিলেন, কুরসী, অলংকার পোশাক ও আয়তলোচনা হুর সমূহ প্রকাশ কর। সে এই সব কিছু প্রকাশ করিল। অনন্তর আল্লাহ তায়ালা নির্দেশ দিলেন, তুমি কিছু কথা বল। সে বলিল, কতইনা সৌভাগ্যবান ঐ ব্যক্তি যে আমার মধ্যে প্রবেশ করিবে। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা বলিলেন, আমার ইজ্জতের কসম আমি কোন কৃপণকে তোমার মধ্যে থাকিতে দিব না।

ওমর ইবনে আব্দুল আযীয (রহঃ)-এর বোন উম্মে বানীন বলেন, ধিক্কার কৃপণের প্রতি। কৃপণতা যদি কোর্তা হইত তবে উহা পরিধান করিতাম না, যদি রাস্তা হইত তবে উহাতে চলিতাম না। হযরত তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহ (রহঃ) বলেন কৃপণদের যে অবস্থা হয় মাল দেয়ার কারণে আমাদেরও সেই অবস্থা হইত তবে আমরা ধৈর্য ধারণ করিব। মুহাম্মদ ইবনে মুনকাদির (রহঃ) বর্ণনা করেন, প্রসিদ্ধ আছে, যে, আল্লাহ তায়ালা যখন কোন সম্প্রদায়ের ব্যাপারে অমঙ্গলের ইচ্ছা করেন তখন সব চাইতে খারাপ ব্যক্তিকে তাহাদের শাসক নিযুক্ত করেন এবং তাহাদের রিযিক দিয়া দেন কৃপণদের হাতে। হযরত আলী (রাদিঃ) এক ভাষনে বলিয়াছেন, মনে রাখ, এমন এক যুগ আসিবে যে, মালদারেরা মাল দাঁতের সাহায্যে আঁকড়ইয়া ধরিবে অথচ তাহাদিগকে ইহার নির্দেশ দেওয়া হয় নাই। আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন -

وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ

"তোমরা পরস্পরে অতিরিক্ত জিনিসকে ভুলিয়া যাইও না।"(১)

আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রাদিঃ) বলেন, আরবীতে শাহীহ এবং বখীলের মধ্যে কিছুটা পার্থক্য রহিয়াছে। বখীলের তুলনায় শাহীহ আরো জঘন্য। শাহীহ ঐ

টীকা -(১) অর্থাৎ প্রয়োজনাতিরিক্ত সম্পদ আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় কর।

ব্যক্তিকে বলে যে নিজের হাতের সম্পদ তো আটকাইয়া রাখেই অন্যের হাতে যাহা আছে উহার ব্যাপারেও কৃপণতা করে। আর বখীল ঐ ব্যক্তিকে বলে- যে নিজের হাতের সম্পদকে আটকাইয়া রাখে। শাবী (রহঃ) বলেন, জাহান্নামের সবচাইতে গভীরে কে নিক্ষিপ্ত হইবে কৃপণতা নাকি মিথ্যা তাহা জানি না।

বাদশাহ নওশেরোয়ার কাছে জনৈক বিজ্ঞানীর সাক্ষাৎকার

বর্ণিত আছে, একবার বাদশাহ নওশেরোয়ার কাছে ভারতের বিজ্ঞানী ও রোমের দার্শনিক আসিলেন। নওশেরোয়া ভারতীয় বিজ্ঞানীকে বলিলেন, কিছু বলুন, তিনি বলিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ ঐ ব্যক্তি যে সাক্ষাৎকালে দানশীলতা, ক্রোধের সময় গাম্ভীর্যতা, কথা বলার সময় ধীর স্থিরতা মর্যাদার সময় বিনয় ও প্রত্যেক আত্মীয় স্বজনের সহিত স্নেহ মমতা অবলম্বন করে। অতঃপর রোমীয় দার্শনিক উঠিয়া বলিলেন, কৃপণের মাল তাহার শত্রুরা ভোগ করে, কৃতঘ্ন ব্যক্তির আশা পূর্ণ হয় না, মিথ্যা বাদী নিন্দিত আর চোগলখোর দরিদ্রাবস্থায় মারা যায় আর যে ব্যক্তি অপরের প্রতি দয়া করে না তাহার উপর জালিম ব্যক্তিকে চাপাইয়া দেওয়া হয় যে তাহার প্রতি দয়া করিবে না।

প্রতিদিন বখীলের জন্য ফেরেশতাদের বদদোয়া

দাহ্হাক আয়াতে কারীমা إِنَّا جَعَلْنَا فِىْ أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا -এর তাফসীরে বলেন, এখানে أَغْلَالًا অর্থ কৃপণতা, আল্লাহ তায়ালা তাহাদের হাত সৎপথে খরচ করা হইতে ফিরাইয়া রাখেন অতএব তাহারা হেদায়াতের পথ দেখিতে ও বুঝিতে পারে না। কাব (রাদিঃ) বলেন, প্রতিদিন ভোরে দুইজন ফেরেশতা দোয়া করে হে আল্লাহ। আপনি কৃপণের সম্পদ তাড়াতাড়ি ধ্বংস করুন আর দানশীলকে তাড়াতাড়ি প্রতিদান দিন। আসমায়ী (রহঃ) জনৈক বেদুঈনকে এক ব্যক্তি সম্পর্কে বলিতে শুনিলেন, সে আমার কাছে তুচ্ছ যেহেতু দুনিয়ার কাছে অতি বড়, কোন ভিক্ষুক তাহার কাছে আসিলে মনে করে যেন মালাকুল মউত হাজির হইয়াছে। ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) বলেন, আমি কোন কৃপণকে ন্যায়পরায়ন মনে করি না। কেননা কৃপণ কৃপণতার তাড়নায় প্রাপ্যের চাইতে আরো বেশী গ্রহণ করিয়া ফেলে যাহাতে না ঠকে। আর যে ব্যক্তির এমন অবস্থা হইবে সে কখনও আমানত রক্ষা করিতে পারিবে না। হযরত আলী (রাদিঃ) বলেন, দানশীল ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি কখনও স্বীয় হক ও প্রাপ্য পুরাপুরি গ্রহণ করে না। আল্লাহ তায়ালা বলেন।

عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ

অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন স্ত্রীদিগকে তাহাদের কৃতকর্মের কথা জানাইয়া দিতে ছিলেন তখন সম্পূর্ণ ঘটনা ব্যক্ত করেন নাই বরং কিছু ব্যক্ত করিয়াছেন আর কিছু বাদ দিয়াছেন।

(বিস্তারিত ঘটনা জানিতে হইলে সূরায়ে তাহরীমের তাফসীর দেখুন।)

ইমাম জাহেয (রহঃ) বলেন, দুনিয়াতে কেবল তিনটি জিনিষের স্বাদ বাকি রহিয়াছে, কৃপণদের নিন্দা, ভূনাগোশত আর খুজলি চুলকানো। বিশর ইবনে হারেছ বলেন, কৃপণের কৃপণতার দোষ বর্ণনা করা গীবতের অন্তর্ভূক্ত নহে। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, এমতাবস্থায় (অর্থাৎ কৃপণকে কৃপণ না বলিলে) তুমিও কৃপণ।

একদা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছে জনৈকা মহিলার প্রশংসা করা হইতেছিল যে, সে অত্যন্ত ইবাদত গুজার। সার'দিন রোযা রাখে এবং সারারাত্র নামায পড়ে তবে তাহার মধ্যে কিছুটা কৃপণতা রহিয়াছে। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলিলেন, এমতাবস্থায় তাহার মধ্যে কোন কল্যাণ নাই। বিশর (রহঃ) বলেন, কৃপনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে অন্তর কঠিন হইয়া যায় এবং কৃপণদের সাক্ষাৎ মুমিনদের জন্য বিপদ স্বরূপ। ইয়াহইয়া ইবনে মুয়ায (রাঃ) বলেন, দানশীলদের প্রতি ভালবাসাই থাকে, যদিও তাহারা গোনাহগার হয় আর কৃপণদের প্রতি বিদ্বেষই থাকে, যদিও তাহারা নেককার হয়। ইবনে মু'য়ায (রহঃ) বলেন, যে ব্যক্তি মালের ব্যাপারে বেশী কৃপণ সে ইজ্জত আবরুর ব্যাপারে বেশী দাতা, (১)

ইবলিসের কাছে সবচাইতে প্রিয় বখীল ব্যক্তি

একবার ইবলিসের সহিত হযরত ইয়াহইয়া (আঃ)-এর দেখা হইল। হযরত ইয়াহইয়া (আঃ) বলিলেন, হে ইবলিস! বলতো তোর কাছে সবচাইতে পছন্দনীয় কোন ব্যক্তি এবং সব চাইতে অপছন্দনীয় কোন ব্যক্তি। ইবলিস বলিল, আমার কাছে সব চাইতে পছন্দনীয় ব্যক্তি হইল কৃপণ মুমেন আর সব চাইতে অপছন্দনীয় ব্যক্তি হইল দানশীল ফাসেক। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহার কারণ কি? সে উত্তরে বলিল, কৃপণের জন্য আমার কিছু করিতে হয় না তাহার কৃপণতাই মন্দের জন্য যথেষ্ট। আর গোনাহগার দানশীল সম্পর্কে আমার আশংকা থাকে নাজানি কখন আল্লাহ তায়ালা দানশীলতার কারণে তাহার প্রতি তাওয়াজ্জু দিয়া ফেলেন আর সে আল্লাহর প্রিয় পাত্র হইয়া যায় তখন আর আমার কোন প্রভাব চলিবে না। অতঃপর ইবলিস এই কথা বলিয়া চলিয়া গেল যে, আপনি যদি ইয়াহইয়া না হইতেন তবে আপনার কাছে এই কথা বলিতাম না। (২)

কৃপনদের ঘটনা

বসরায় এক ধনাঢ্য ব্যক্তি ছিল। কিন্তু সে অত্যন্ত কৃপণ ছিল। তাহার এক প্রতিবেশী তাহাকে একদিন দাওয়াত করিল এবং তাহার সম্মুখে গোশতের কীমার সহিত ডিম পেশ করিল। সে গোশত ও ডিম খুব খাইল। তারপর পানি পান করিতে শুরু করিল। কিছুক্ষণ পর তাহার পেট ফুলিতে আরম্ভ করিল। অবস্থা

টীকা -(১) তাহার ইজ্জত আবরু বিনষ্ট হইয়া যায়।
(২) কেননা আপনি যদি দানশীল না হইতেন তবে আপনাকে এই কথা বলিতাম না।

গুরুতর দেখিয়া ডাক্তারের শরনাপন্ন হইল। ডাক্তার তাহাকে বলিল, কোন অসুবিধা নাই বমি করিয়া বাহির করিয়া দিন। সে বলিল, আপনি কি বলেন? এই গোশত আর ডিম বমি করিয়া ফেলিয়া দিব? ইহা কিছুতেই হইতে পারে না ইহার চাইতে মৃত্যু উত্তম।

বর্ণিত আছে, জনৈক বেদুঈন এক ব্যক্তির খোঁজে বাহির হইল। তাহার সম্মুখে তীন (ডুমুর) রাখা ছিল। বেদুঈনকে দেখিয়া সে তীন চাদরের নীচে লুকাইয়া ফেলিল। বেদুঈন তাহার কাছে বসিয়া রহিল। কতক্ষণ পর ঐ ব্যক্তি বেদুঈনকে বলিল, তুমি কোরআন পড়িতে জান? বেদুঈন বলিল হ্যাঁ, অতঃপর সে আয়াত তেলাওয়াত করিল। অর্থাৎ সূরার শুরুতে যে তীন শব্দ রহিয়াছে উহা পরিল না ঐ ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল তীন কোথায়? বেদুঈন বলিল, উহা তোমার চাদরের নীচে।

এক ব্যক্তি তাহার বন্ধুকে দাওয়াত করিল। সকাল হইতে আসর পর্যন্ত তাহাকে বসাইয়া রাখিল কিন্তু কিছুই খাওয়াইল না। যখন প্রচন্ড ক্ষুধায় অচেতন হইয়া পড়িতে ছিল তখন একটি সেতারা হাতে লাইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, আপনার কোন আওয়াজ শুনিতে ভাল লাগে? সে উত্তরে বলিল, গোশত ভূনা করার আওয়াজ।

মুহাম্মদ ইবনে ইয়াহইয়া বারমাকী অত্যন্ত কৃপণ ছিল। তাহার জনৈক আত্মীয়কে জিজ্ঞাসা করা হইল, যে তাহার সম্বন্ধে ভালরূপে জ্ঞাত ছিল, মুহাম্মদ ইবনে ইয়াহইয়ার দস্তরখানের বর্ণনা দাও তো। সে বলিল, চার আঙ্গুল দৈর্ঘ চার আঙ্গুল প্রস্থ। তাহার পেয়ালা এত ছোট যেন সরিষা দানা দ্বারা তৈরি করা হইয়াছে। জিজ্ঞাসা করা হইল এই দস্তরখানে কে উপস্থিত থাকে? উত্তরে বলিল, কেরামান কাতেবীন ফেরেশতা(১)। তারপর জিজ্ঞাসা করা হইল, মুহাম্মদ ইবনে ইয়াহইয়ার সহিত অন্য কেহ খাবার খায় কি? সে বলিল হ্যাঁ, মাছি তাহার সহিত খায়। তাহাকে বলা হইল, তোমার কাপড়টি ছেড়া হওয়ার কারণে লজ্জাস্থান দেখা যাইতেছে অথচ তুমি মুহাম্মদ ইবনে ইয়াহইয়ার বিশেষ ব্যক্তি। সে বলিল, একটি সুইয়ের অভাবে কাপড়টি সেলাই করিতে পারিতেছি না। আল্লাহর কসম মুহাম্মদ ইবনে ইয়াহইয়া যদি বাগদাদ হইতে নাউবা পর্যন্ত বিশাল একটি ঘরের মালিক হয় আর উহা সুই দ্বারা ভরতি থাকে আর হযরত ইয়াকূব (আঃ) জিব্রাঈল ও মিকাঈল (আঃ) সহ আসিয়া হযরত ইউসুফ (আঃ) এর ঐ কুর্তা সেলাই করার জন্য একটি সুই চায় যাহা পিছন দিয়া ছিন্ন হইয়াছিল তবু মুহাম্মদ ইবনে ইয়াহইয়া একটি সুই দিবে না।

কথিত আছে, মারোয়ান ইবনে আবু হাফসা কৃপণতা করিয়া কখনও গোশত খাইত না। যখন গোশত খাওয়ার খুব স্পৃহা হইত তখন গোলামকে পাঠাইয়া একটি মাথা খরিদ করিয়া আনিত এবং উহাই খাইত। একবার তাহাকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করা হইলে সে বলিল, গোশত খরিদ করার মধ্যে গোলামের পক্ষ হইতে খেয়ানতের আশংকা রহিয়াছে, আর মাথার মূল্য যেহেতু আমার জানা

টীকা- (১) অর্থাৎ দস্তরখানে শুধু সেই খানা খায়।

আছে তাই ইহাতে উক্ত আশংকা নাই। দ্বিতীয়ত গোশত রান্না করার সময় গোলাম উহা হইতে কিছু খাইয়া ফেলিলে বুঝা যাইবে না কিন্তু মাথা হইতে কিছুই খাইতে পারিবে না। কেননা ইহার চোখ বা কান কিংবা গন্ডদেশ যে কোনটিতে হাত লাগাইবে আমি টের পাইয়া যাইব। তৃতীয়ত ইহাতে আমি বিভিন্ন রকম স্বাদ পাইতেছি। চোখের ভিন্ন স্বাদ, কানের ভিন্ন স্বাদ জিহবার ভিন্ন স্বাদ, ঘাড়ের ভিন্ন স্বাদ, মগজের ভিন্ন স্বাদ, অধিকন্তু গোশত রান্না করার যে একটা কষ্ট উহা হইতে বাঁচিয়া যাইতেছি। এই সমস্ত উপকারিতার দিকে লক্ষ্য করতঃ আমি মাথা খাওয়াকে অগ্রাধিকার দিয়াছি।

মারোয়ান ইবনে আবু হাফসা একদিন খলীফা মাহদীর দরবারে যাইতে ছিল। তাহার ঘরের এক মহিলা বলিল, যদি খলীফা তোমাকে কিছু উপঢৌকন দেন তবে আমাকে কি দিবে? সে বলিল, একলক্ষ দেরহাম দিলে তোমাকে এক দেরহাম দিব। খলীফা তাহাকে ষাট হাজার দেরহাম দান করিলেন। সে ঐ মহিলাকে প্রতিশ্রুত হিসাব অনুযায়ী এক দেরহামের তিন পঞ্চমাংশ দিল।

এই মারোয়ান ইবনে আবু হাফসাই একবার এক দেরহামের গোশত খরিদ করিয়াছিল। ঘটনাক্রমে ঐ দিন তাহার এক বন্ধু তাহাকে দাওয়াত করিল। সে ঐ গোশত কসাইয়ের কাছে লইয়া গেল এবং কসাইকে বলিল, আজ আমার দাওয়াত আছে তাই গোশতটুকু তুমি ফেরৎ নিয়া নাও। অতঃপর দেরহাম ফেরৎ লইয়া লইল এবং এক চতুর্থাংশ দেরহাম কসাইয়ের নিকট হইতে কম নিল। আর এই কথা বলিল যে, অপব্যয় আমি পছন্দ করি না।

আমাশ (রহঃ)-এর এক প্রতিবেশী ছিল। সে প্রায়শঃ তাঁহাকে দাওয়াত করিত আর বলিত, আমার ঘরে যাইয়া যদি রুটির টুকরা ও লবণ খাইতেন তবে খুবই ভাল হইত। আমাশ (রহঃ) সব সময় পাশ কাটিয়া যাইতেন। আরেক দিন এমনিভাবে দাওয়াত পেশ করিল। ঐ দিন ঘটনাক্রমে আমাশ (রহঃ) ক্ষুধার্ত ছিলেন। তিনি দাওয়াত কবুল করিলেন এবং বলিলেন, চল যাই। ঘরে যাওয়ার পর বাস্তবিকই সে রুটির টুকরা ও কিছু লবণ আনিয়া হাজির করিল। ইত্যবসরে এক ভিক্ষুক আসিয়া ভিক্ষা চাহিল। বাড়ীওয়ালা (দাওয়াত কারী) ভিক্ষুককে বলিল, আল্লাহ তোমাকে বরকত দান করুন। (১) দ্বিতীয়বার আবার চাহিল বাড়ীওয়ালা আবার বলিল, আল্লাহ তোমাকে বরকত দান করুন। তৃতীয়বার যখন চাহিল তখন সে বলিল, হয়ত এখান হইতে যাইবে নচেৎ এখনই লাঠি লইয়া বাহির হইতেছি। তখন আমাশ (রহঃ) ভিক্ষুককে ডাক দিয়া বলিলেন, তুমি তাড়াতাড়ি চলিয়া যাও। এই বাড়ীওয়ালা ওয়াদা রক্ষার ব্যাপারে বড়ই পাকা। বহুদিন যাবৎ আমাকে রুটির টুকরা ও লবণের দাওয়াত করিতেছে আজ আসিয়া হুবহু তাহাই পাইয়াছি। সামান্য একটু বেশীও পাই নাই।

টীকা -(১) অর্থাৎ চলিয়া যাও দেওয়ার মত কিছু নাই।

ঈছার বা উদারতার মহত্ব

দানশীলতা ও কৃপণতা উভয়টির অনেক স্তর রহিয়াছে। দানশীলতার সর্বোচ্চ স্তর হইল ঈছার বা উদারতা অর্থাৎ অভাব সত্ত্বেও দান করা। দানশীলতার আসল অর্থ হইল যাহার প্রয়োজন নাই এমন জিনিষ অভাবগ্রস্ত বা অভাব মুক্ত ব্যক্তিকে দান করা। প্রয়োজন থাকা অবস্থায় দান করা আরো বেশী প্রশংসনীয়, দানশীলতার সর্বোচ্চ স্তর হইল নিজে অভাবগ্রস্ত থাকা সত্ত্বেও মাল অন্যকে দান করা, আর কৃপণতার সর্বশেষ স্তর হইল, নিজের প্রয়োজনেও খরচ না করা। অনেক কৃপণ এমন আছে, রোগাক্রান্ত হইয়া কষ্ট করে কিন্তু চিকিৎসা করায় না। কোন একটি ভাল জিনিষ খাইতে মনে চায় কিন্তু পয়সা খরচের ভয়ে খায় না। তবে মুফৎ ও বিনা পয়সায় পাইলে অবশ্য খাইত। এই কৃপণ নিজের প্রয়োজনেই খরচ করিতেছে না, আর ঐ দাতা নিজের প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও অন্যকে অগ্রাধিকার দিতেছে। এখন এই দুই ব্যক্তির মধ্যে কি পার্থক্য লক্ষ্য করুন। চরিত্র এমন এক নেয়ামত আল্লাহ তায়ালা যাহাকে ইচ্ছা তাহাকেই দান করেন। এইরূপ উদারতার উর্ধে দানশীলতার আর কোন স্তর নাই। আল্লাহ তায়ালা সাহাবায়ে কেরামের প্রশংসা স্বরূপ বলেন -

وَيُؤْثِرُوْنَ عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ -

"তাহারা অন্যকে নিজের উপর অগ্রাধিকার দেয় যদিও ক্ষুধার্ত থাকে।"

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, কাহারো যদি কোন একটি জিনিষ মনে চায় আর সে নিজের চাহিদাকে বাদ দিয়া অন্যকে অগ্রাধিকার দেয় তবে তাহাকে ক্ষমা করিয়া দেওয়া হয়। হযরত আয়েশা (রাদিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ শেষ জীবন পর্যন্ত লাগাতার তিন দিন পেট ভরিয়া খান নাই। আমরা ইচ্ছা করিলে পেট ভরিয়া খাইতে পারিতাম কিন্তু অন্যকে অগ্রাধিকার দিয়াছি।

জনৈক আনসারী সাহাবীর অসাধারণ ইচ্ছার বা অপরকে অগ্রাধিকার দান

একদা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ঘরে একজন মেহমান আসিল। ঐ সময় ঘরে খাইবার কিছুই ছিল না। তাই জনৈক আনসারী সাহাবী ঐ মেহমানকে আপন গৃহে লইয়া গেলেন। রাত্রিবেলা ছিল। মেহমানের খানা হাজির করিয়া স্ত্রীকে বাতি নিভাইয়া দিতে বলিলেন। নিজে হাত আনা নেওয়া করিতে ছিলেন যাহাতে মেহমান বুঝে যে, মেযবানও খাইতেছে। অথচ তিনি কিছুই খান নাই। মেহমান পরিতৃপ্তির সাহিত খাইল। সকালে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উক্ত আনসারী সাহাবীকে বলিলেন, আল্লাহ তায়ালা তোমাদের কাজে অত্যন্ত খুশী হইয়াছেন এবং তোমাদের সম্পর্কে এই আয়াত নাযিল হইয়াছে -

وَيُؤْثِرُوْنَ عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ -

" তাহারা অন্যকে নিজের উপর অগ্রাধিকার দেয়, যদিও ক্ষুধার্ত থাকে।"

দানশীলতা আল্লাহ তায়ালার গুনাবলীর মধ্য হইতে একটি গুন। আর অন্যকে অগ্রাধিকার দেওয়া দানশীলতার সর্বোচ্চ স্তর। আর ইহা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) -এর চরিত্র ছিল। তাই আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করিয়াছেন,

إِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ

"নিশ্চয় আপনি মহান চরিত্রের অধিকারী।"

উম্মতে মুহাম্মদীর ঈছারের (আত্মত্যাগ)প্রশংসা হযরত মূসা (আঃ) -এর নিকট

সাহল ইবনে আব্দুল্লাহ তাসতারী (রহঃ) বর্ণনা করেন, একবার হযরত মূসা (আঃ) আল্লাহ তায়ালার দরবারে আরজ করিলেন, হে আল্লাহ! মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এবং তাঁহার উম্মতের কিছু মর্যাদা আমাকে দেখাইয়া দিন। আল্লাহ তায়ালা বলিলেন, হে মূসা! তুমি ঐ সমস্ত মর্যাদা দেখিতে সক্ষম হইবে না। আমি তোমাকে কেবল একটি মর্যাদা দেখাইতেছি যাদ্বারা তাহাকে তোমার উপর এবং সমস্ত মখলুকের উপর মর্যাদাবান করিয়াছি। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা উর্ধ জগতের পর্দা সরাইয়া দিলেন এবং হযরত মূসা (আঃ) কেবল একটি মর্যাদার প্রতি তাকাইলেন তৎক্ষনাৎ নূরের তাজাল্লীতে এবং আল্লাহ তায়ালার সন্নিধ্যের কারণে হযরত মূসা (আঃ)-এর যেন প্রাণ বাহির হইয়া যাইতেছিল। তখন তিনি আরজ করিলেন, ইয়া আল্লাহ। আপনি তাহাকে কিসের বদৌলতে এই মর্যাদায় আসীন করিয়াছেন? আল্লাহ তায়ালা বলিলেন, এমন চরিত্রের বদৌলতে যাহা বিশেষভাবে তাঁহাকেই দান করা হইয়াছে। সেইটি হইল আত্মত্যাগ ও অপরকে অগ্রাধিকার দান। হে মূসা। কেহ যদি তাহার জীবনে কোন একবার এই আত্মত্যাগ অবলম্বন করে আর আমার কাছে আসে তবে তাহার হিসাব গ্রহণ করিতে আমার লজ্জা বোধ হয়। এবং আমি তাহাকে জান্নাতের যেখানে চায় সেখানে স্থান করিয়া দেই।

জনৈক গোলামের আত্মত্যাগ

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে জাফর (রাদিঃ) একদা স্বীয় জমি দেখার জন্য বাহির হইলেন। পথে একটি খেজুরের বাগানে অবস্থান করিলেন। বাগানে একটি হাবশী গোলাম কাজ করিতেছিল। কিছুক্ষন পর গোলামের খাবার আসিল। ইত্যবসরে একটি কুকুর তাহার কাছে আসিয়া উপস্থিত হইল। সে কুকুরের দিকে একটি রুটি ছুঁড়িয়া দিল। ইহা খাইয়া শেষ করিলে আরেকটি রুটি ছুঁড়িল। ইহা খাইয়া শেষ করিলে আরেকটি রুটি ছুঁড়িল। এই ভাবে তিনটি রুটি কুকুরকে দিয়া দিল। আব্দুল্লাহ ইবনে জাফর (রাদিঃ) গোলামকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার দৈনিক খাবার কি পরিমান? সে বলিল, যাহা দেখিতে পাইয়াছেন। আব্দুল্লাহ ইবনে জাফর বলিলেন, তাহা হইলে কুকুরকে সবগুলি দিয়া দিলে কেন? সে বলিল, এই অঞ্চলে কোন কুকুর নাই। কুকুরটি অবশ্যই বহুদূর হইতে আসিয়াছে। তাই সে

ক্ষুধার্ত, এই জন্য আমার পছন্দ হইল না যে, আমি পেট ভরিয়া খাইব আর কুকুরটি ক্ষুধার্ত থাকিবে। আব্দুল্লাহ্ ইবনে জাফর (রাদিঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি আজ কি খাইবে? সে বলিল, আজ ক্ষুধার্তই থাকিব। আব্দুল্লাহ্ ইবনে জাফর (রাদিঃ) মনে মনে চিন্তা করিলেন, আমি তাহাকে দানশীলতার কারণে গঞ্জনা করিতেছি? সে তো আমার চাইতে বেশী দানশীল। অতঃপর তিনি গোলামসহ উক্ত বাগান খরিদ করিয়া ফেলেন। তারপর গোলামকে আযাদ করতঃ ঐ বাগান তাহাকে দান করিয়া দেন।

জনৈক সাহাবীর আত্মত্যাগ

হযরত ওমর (রাদিঃ) বর্ণনা করেন একবার কোন এক সাহাবীকে কেহ একটি বকরীর মাথা হাদিয়া দেন। তিনি মনে মনে বলিলেন, অমুক তো আমার চাইতেও ক্ষুধার্ত। অতএব তিনি ইহা তাহার কাছে পাঠাইয়া দিলেন। এই ভাবে একজনের হাত হইতে আরেক জনের হাতে যাইতে যাইতে সাত বার ঘুরিবার পর পুনরায় প্রথম ব্যক্তির হাতে ফিরিয়া আসে।

হযরত আলী (রাদিঃ)-এর আত্মত্যাগ

হিজরত কালে যে রাত্রে হযরত আলী (রাদিঃ) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর শয্যায় শায়িত ছিলেন ঐ সময় আল্লাহ তায়ালা হযরত জিব্রাঈল (আঃ) ও হযরত মিকাঈল (আঃ)-কে বলিলেন, তোমাদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন করাইয়া দিলাম এবং এক জনের আয়ূ বৃদ্ধি করিয়া দিলাম। এখন তোমাদের মধ্যে কে ইহা পছন্দ করিবে এবং অপর ভাইকে অগ্রাধিকার দিবে যে আমার মৃত্যু আগে হউক আর আমার ভাই দীর্ঘজীবি হউক? তাহাদের প্রত্যেকেই নিজের জন্য দীর্ঘায়ু কামনা করিলেন কেহই কাহাকেও অগ্রাধিকার দিলেন না। তখন আল্লাহ তায়ালা বলিলেন, তোমরা আলীর মত হও নাই। আমি আলী এবং আমার হাবীবের পরস্পরে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন করিয়াছি। আজ রাত্রে আলী আমার হাবীবের শয্যায় শায়িত থাকিয়া নিজের জীবনকে তাঁহার জন্য উৎসর্গ করিতেছে। তাঁহার জীবনকে নিজের জীবনের উপর অগ্রাধিকার দিতেছে। এখন তোমরা পৃথিবীতে যাও এবং আলীর হেফাজত কর। নির্দেশ হওয়া মাত্রই তাঁহারা পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইলেন। অতঃপর হযরত জিব্রাঈল (আঃ) হযরত আলী (রাদিঃ)-এর শিয়রে এবং হযরত মিকাঈল (আঃ) পায়ের দিকে দাড়াইয়া পাহারায় রহিলেন। হযরত জিব্রাঈল (আঃ) বলিলেন, সাবাস হে আবু তালেব তনয়। আজ আল্লাহ তায়ালা ফেরেশতাদের সহিত তোমাকে লইয়া গর্ব করিতেছেন। অতঃপর এই আয়াত অবতীর্ণ হয়-

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْرِىْ نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ رَءُوْفٌ بِالْعِبَادِ –

"কতক লোক রহিয়াছে যাহারা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে আপন জীবন বিসর্জন দিয়া দেয়। আর আল্লাহ্ আপন বান্দাদের প্রতি অতি দয়াবান।"

সহমর্মিতার আত্মত্যাগ

আবুল হাসান আনতাকী (রহঃ) বর্ণনা করেন, একবার রায় শহরের সন্নিকটে কোন এক গ্রামে ত্রিশজনের অধিক লোক সমবেত হইল। তাহাদের কাছে মাত্র সীমিত কয়েকটি রুটি ছিল। যাহা সকলের জন্য যথেষ্ট ছিল না। রাত্রিবেলা খাইবার সময় রুটিগুলি টুকরা টুকরা করতঃ বাতি নিভাইয়া সবাই খাইতে বসিল। অবশেষে যখন দস্তরখান উঠানো হইল তখন দেখা গেল খানা সম্পূর্ণ বহাল, আপন সাথীকে অগ্রাধিকার দিতে গিয়া কেহই খায় নাই।

বর্নিত আছে, একবার হযরত শু'বা (রহঃ)-এর কাছে এক ভিক্ষুক আসিয়া ভিক্ষা চাহিল। ঐ সময় তাঁহার কাছে কিছুই ছিল না। তিনি ঘরের একটি লাকড়ী খুলিয়া ভিক্ষুককে দিয়া দিলেন এবং নিজের উযর প্রকাশ করিলেন।

হুযাইকা আফাভী (রহঃ) বলেন, আমি ইয়ারমুকের যুদ্ধে কিছু পানি লইয়া আমার চাচাত ভাইয়ের তালাশে বাহির হইলাম, উদ্দেশ্য ছিল, যদি জীবিত থাকে তবে তাহাকে পানি পান করাইব এবং তাহার চেহারা সিক্ত করিব। হঠাৎ তাহার সাক্ষাৎ পাইলাম, আমি জিজ্ঞাসা করিলাম পানি পান করাইব? ইশারায় বলিল, হ্যাঁ, অমনি নিকস্থ এক ব্যক্তির আহ্ শুনিতে পাইল। তখন আমাকে ইশারায় ঐ ব্যক্তির কাছে পানির পেয়ালা লইয়া যাইতে বলিল। আমি ঐ ব্যক্তির কাছে গেলাম তৎক্ষনাৎ আরেক ব্যক্তির আহ্ শুনিতে পাইল। তখন সে ইশারায় বলিল পানির পেয়ালা তাহার কাছে লইয়া যাও। আমি তাহার কাছে গেলাম যাইয়া দেখি সে মারা গিয়াছে। সাথে সাথে দ্বিতীয় ব্যক্তির কাছে গেলাম দেখি সেও মারা গিয়াছে। তারপর আমার চাচাত ভাইয়ের কাছে গিয়া দেখি সেও শেষ নিঃশাস ত্যাগ করিয়াছে। (আল্লাহ তায়ালা তাহাদের সবার প্রতি রহমত বর্ষণ করুন।)

বিশর (রহঃ)-এর আত্মত্যাগ

আব্বাস ইবনে দিহকান বলেন, দুনিয়াতে যেইভাবে আগমন হইয়াছে সেই ভাবে কেহই দুনিয়া হইতে যাইতে পারে নাই তবে একমাত্র বিশর ইবনে হারেছ পারিয়াছেন। তাহার কাছে একবার জনৈক ব্যক্তি আসিয়া অভাবের কথা ব্যক্ত করিল। তিনি তখন মৃত্যু রোগে আক্রান্ত ছিলেন। তৎক্ষনাৎ তিনি নিজের পরনের জামাটি খুলিয়া তাহাকে দিয়া দেন এবং অন্যের নিকট হইতে আরেকটি জামা ধার করিয়া দেহ আবৃত করেন।

একটি কুকুরের বিস্ময়কর আত্মত্যাগ

জনৈক সুফী বর্ণনা করেন, আমরা একদল লোক তারসূস শহর হইতে বাবে জিহাদের উদ্দেশ্যে বাহির হইলাম। শহরের একটি কুকুরও আমাদের পিছনে পিছনে চলিল। বাবেজিহাদের নিকটে পৌছিলে একটি মৃত প্রাণী দেখিতে পাইলাম। আমরা একটি উচুঁ জায়গায় যাইয়া বসিলাম। কিন্তু কুকুরটি শহরে ফিরিয়া গেল। কিছুক্ষনের মধ্যেই তাহার সহিত আরো বিশটি কুকুর চলিয়া

আসিল। সবাই ঐ মৃত প্রাণীর গোশত খাইতে শুরু করিল। কিন্তু ঐ কুকুরটি পার্শ্বে বসিয়া রহিল। অন্যান্য কুকুরেরা খাইতে ছিল আর সে পাশে বসিয়া দেখিতেছিল। যখন গোশত শেষ হইয়া গেল এখন কেবল হাড়গুলি রহিল তখন সমস্ত কুকুর শহরে চলিয়া গেল। এই বার ঐ কুকুরটি আসিয়া অবশিষ্ট হাড় ও তৎসঙ্গে যে সামান্য গোশত ছিল উহা খাইয়া চলিয়া গেল। (এই ছিল একটি কুকুরের উদাহরন)

দরিদ্র অধ্যায়ে আত্মত্যাগ সম্পর্কিত হাদীছ আউলিয়া কেরামের ঘটনাবলী সহ বর্ণনা করা হইয়াছে তাই এখানে ঐ গুলি বর্ণনা করার প্রয়োজন নাই।

দানশীলতা ও কৃপণতার সজ্ঞা

শরয়ী দলীল দ্বারা ইহা প্রমাণিত যে, কৃপণতা ধ্বংসাত্মক বিষয়। তবে প্রশ্ন হইল যে, কৃপণতার সংজ্ঞা কি এবং মানুষ কিসের দরুন কৃপণ আখ্যায়িত হয়? প্রত্যেক ব্যক্তিই নিজেকে দানশীল মনে করে অথচ অন্যের কাছে সে কৃপণ বিবেচিত। কখনও কেহ একটি কাজ করে তখন কতক বলে ইহা কৃপণতা আর কতক বলে ইহা কৃপণতা নহে। আর প্রত্যেক মানুষের মধ্যে সম্পদমোহ রহিয়াছে। তাইতো সে মালের হেফাজতও করে এবং মাল সঞ্চয় করে। যদি শুধু সঞ্চয়ের কারণে কৃপণ হয় তবে কোন মানুষই কৃপণতা মুক্ত হইতে পারিবে না। আর যদি কোন সঞ্চয়ই কৃপণতা না হয় তবে ইহা ও সঠিক নহে। কেননা কৃপণতা মানেই মাল সঞ্চয় করা ও নিজের কাছে জমা করিয়া রাখা। তাই কৃপণতা কোনটি যাহা ধ্বংসাত্মক এবং দানশীলতার পরিচয় কি যাদ্বারা দানশীল ব্যক্তি ছাওয়াবের অধিকারী হইবে তাহা সুস্পষ্ট রূপে বর্ণনা করা আবশ্যক।

কতক বলেন, কৃপণতা হইল ওয়াজিব আদায়ে বিরত থাকা। অতএব কেহ যদি ওয়াজিব আদায় করিয়া ফেলে তবে তাহাকে কৃপণ বলা হইবে না। এই সংজ্ঞা যথেষ্ট নহে। কেননা যে ব্যক্তির কসাইয়ের নিকট গোশত খরিদ করার পর এবং রুটি ওয়ালার নিকট হইতে রুটি খরিদ করার পর, কিছু কম দামে উক্ত গোশত বা রুটি ফেরৎ দেয় এমন ব্যক্তি সর্বসম্মতি ক্রমে কৃপণ গণ্য হইবে। এমনিভাবে কাযী যদি কাহারো পরিবারের খরচ নির্ধারণ করিয়া দেয় অতঃপর সে উক্ত নির্ধারিত পরিমানের চাইতে এক লোকমা অথবা একটি খেজুর বেশী খাওয়ার কারণে গঞ্জনা করে তবে সেও সকলের কাছে কৃপণ বলে গন্য হইবে। অনুরূপভাবে কাহারো সম্মুখে যদি একটি রুটি থাকে আর এমতাবস্থায় এমন এক ব্যক্তি উপস্থিত হয় যে তাহার সহিত খাওয়ায় শরিক হইবে বলিয়া বুঝায় আর সে রুটিটি লুকাইয়া ফেলে তবে সেও নিঃসন্দেহে কৃপণ।

আর কতক বলেন, কৃপণ ঐ ব্যক্তি যাহার নিকট দান করাকে কষ্টকর মনে হয়। তবে এই সংজ্ঞাও ত্রুটি মুক্ত নহে। কেননা যদি যে কোন দান কষ্টকর মনে হওয়া উদ্দেশ্য হয়, তবে বহু কৃপণ এমন আছে যে, তাহাদের এক দুই পয়সা দান করিতে কষ্ট মনে হয় না। আর যদি বিশেষ কোন দান উদ্দেশ্য হয়, তবে অনেক

দানশীলও এমন রহিয়াছে যাহাদের কাছে কোন কোন দান কঠিন ও কষ্টকর মনে হয়। যেমন সম্পূর্ণ মাল দান করিয়া দেয় অথবা মালের বিরাট অংশ দান করিয়া দেওয়া। ইহার কারণে কাহাকেও কৃপণ বলা হয় না।

অনুরূপ ভাবে দানশীলতার সংজ্ঞার ব্যাপারেও মতপার্থক্য রহিয়াছে। কেহ বলেন, উপকারের কথা বর্ণনাকারী ছাড়া কাহাকেও দান করা এবং নির্দ্বিধায় কাহারো অভাব মোচন করার নাম দানশীলতা, কেহ বলেন দানশীলতা হইল চাওয়া ব্যতিরেকেই কাহাকেও কিছু দান করা এবং মনে করা যে, তাহাকে কম দিয়াছি। কেহ বলেন, দান শীলতা হইল, ভিক্ষুককে দেখিয়া আনন্দিত হওয়া এবং সন্তুষ্ট চিত্তে দান করা, যখনই দান করা সম্ভব হয়। কেহ বলেন, দানশীলতা হইল এই খেয়াল করতঃ কাহাকেও কিছু দানকরা যে, আল্লাহর মাল আল্লাহর বান্দাকে দান করিতেছি আর দারিদ্রের আশংকা না করা। কেহ কেহ দানশীলতাকে কয়েক স্তরে বিভক্ত করিয়াছেন। যে কিছু দান করে আর কিছু নিজের কাছে রাখিয়া দেয় সে হইল সাখা-এর অধিকারী, যে অধিক দান করিয়া দেয় আর নিজের জন্য অল্প রাখিয়া দেয় সে হইল জুদ এর অধিকারী আর যে নিজে কষ্ট ও অসুবিধা ভোগ করতঃ অন্যের অভাব মোচন করে সে হইল ঈছার বা আত্মত্যাগ এর অধিকারী। আর যে কিছুই দান করে না সে হইল কৃপন।

উপরোল্লেখিত দানশীলতা ও কৃপণতা সম্পর্কিত কোন সংজ্ঞাই পরিপূর্ণ ও ক্রুটি মুক্ত নহে। এই ক্ষেত্রে আমি বলিব মাল বিশেষ হেকমত ও উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করা হইয়াছে। উহা হইল মখলুকের প্রয়োজন মিটানো। এখন যে উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করা হইয়াছে উহার জন্য ব্যয় করা হইতে বিরত ও থাকা যাইতে পারে আবার যে ক্ষেত্রে ব্যয় করা সমীচীন নহে সেই ক্ষেত্রেও ব্যয় করা যাইতে পারে। এমনি ভাবে ইনসাফের সহিত ব্যয় করা যাইতে পারে ইনসাফের সাহিত ব্যয় করার অর্থ হইল, যে ক্ষেত্রে সংরক্ষণ করা ওয়াজিব বা অপরিহার্য সেই ক্ষেত্রে সংরক্ষণ করা আর যে ক্ষেত্রে ব্যয় করা ওয়াজিব সেই ক্ষেত্রে ব্যয় করা। অতএব যে ক্ষেত্রে ব্যয় করা ওয়াজিব সেই ক্ষেত্রে ব্যয় করা হইতে বিরত থাকা হইল কৃপনতা। আর যে ক্ষেত্রে ব্যয় করণ হইতে বিরত থাকা ওয়াজিব সেই ক্ষেত্রে ব্যয় করা তাবসীর বা অপব্যয়। এই দুই স্তরের মাঝামাঝি স্তরকে শাখা, জুদ অর্থাৎ দানশীলতা বলা চাই? আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেনঃ

وَالَّذِيْنَ إِذَا أَنْفَقُوْا لَمْ يُسْرِفُوْا وَلَمْ يَقْتُرُوْا وَكَانَ بَيْنَ ذَالِكَ قَوَامًا ـ

"আর ঐ সমস্ত লোক যাহারা খরচ করার সময় অপব্যয়ও করেনা সংকীর্ণতাও করে না আর এতদুভয়ের মাঝে রহিয়াছে জীবিকা নির্বাহের এক সরল পন্থা"

উক্ত আয়াত দ্বারা বুঝা যায় দানশীলতা, অপচয় ও কৃপণতার মধ্যবর্তী পন্থা। তাহা হইল ব্যয় ও সঞ্চয় উভয়টি প্রয়োজন অনুসারে হওয়া। আর দানশীল হওয়ার জন্য সন্তুষ্ট চিত্তে ব্যয় করা অপরিহার্য। কেহ যদি প্রয়োজনের ক্ষেত্রে মাল খরচ

করিল কিন্তু মন তুষ্ট নহে তবে সে প্রকৃত দানশীল নহে বরং কৃত্রিম দানশীল। বরং দানশীল ব্যক্তিকে এমন হইতে হইবে যে, মালের সহিত তাহার অন্তরের কোন সম্পর্কই থাকিবে না। কেবল এতটুকু সম্পর্ক থাকিতে পারে যে, যে ক্ষেত্রে মাল খরচ করা ওয়াজিব ঐ ক্ষেত্রে খরচ করার ইচ্ছা থাকা।

এখন প্রশ্ন হইল, ইহার জন্য তো ওয়াজিবের পরিমান জানিতে হইবে। এই সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা হইল, ওয়াজিব দুই প্রকার। একটি শরয়ী ওয়াজিব আরেকটি হইল মানবতার দৃষ্টিতে ওয়াজিব। দানশীল ঐ ব্যক্তি যে শরয়ী ওয়াজিব হউক বা মানবতার দৃষ্টিতে ওয়াজিব কোনটিই পরিত্যাগ করে না। যদি কোন একটি পরিত্যাগ করিয়া দেয় তবে সে কৃপণ গণ্য হইবে। তবে শরয়ী ওয়াজিব পরিত্যাগকারী কঠিন কৃপণ বলিয়া বিবেচিত হইবে। যেমন কেহ যাকাত দান করিলনা অথবা আপন পরিবার পরিজনের ভরন পোষণ দিল না অথবা যাকাত দান করিল বটে কিন্তু ইহা তাহার কাছে খুব কঠিন মনে হইল। এই ব্যক্তি স্বভাবগত ভাবে কৃপণ, দানশীলতা হইল কৃত্রিমতা ও লৌকিকতা। অথবা যাকাত আদায় করার সময় নিকৃষ্ট মাল দিতে চায় উৎকৃষ্ট কিংবা মধ্যম মাল দিতে মনে চায় না। এই সব কিছুই কৃপণতার অন্তুর্ভুক্ত।

আর মানবতার দৃষ্টিতে যে ব্যয় ওয়াজিব তাহা হইল,সামান্য সামান্য বিষয়ে সংকীর্ণতা পরিহার করা। ইহা অত্যন্ত দোষনীয়। তবে ব্যক্তি ও অবস্থা বিশেষে ইহার স্তর ভেদ রহিয়াছে। যে অধিক সম্পদশালী, তাহার জন্য যে সংকীর্ণতা দোষনীয় হইবে একজন দরিদ্র ব্যক্তির জন্য উহা দোষনীয় হইবে না। আপন পরিবার পরিজনের ক্ষেত্রে যে সংকীর্ণতা দোষনীয় অপরের ক্ষেত্রে তাহা দোষনীয় হইবে না। প্রতিবেশীর ক্ষেত্রে যে সংকীর্ণতা দোষনীয় হইবে দূরবর্তীদের ক্ষেত্রে তাহা দোষণীয় হইবে না। দাওয়াতে যে সংকীর্ণতা দোষনীয়, লেনদেনে উহা দোষণীয় হইবে না। এমনি ভাবে বস্তু ভেদেও ইহার স্তর ভেদের সৃষ্টি হইবে। যেমন খাবারের ব্যাপারে যে সংকীর্ণতা দোষণীয় উহা কাপড় বা অন্যান্য জিনিসের ব্যাপারে দোষণীয় হইবে না। কাফনের কাপড়, কুরবানীরপশু, সদকার রুটি ইত্যাদির ক্ষেত্রে যে সংকীর্ণতা দোষণীয় অন্য ক্ষেত্রে উহা দোষনীয় হইবে না। অনুরূপভাবে যাহাদের সহিত সংকীর্ণতা করা হইবে, তাহাদের অবস্থা ভেদেও হুকুম ভিন্ন হইবে। যেমন, বন্ধু-বান্ধব, ভাই, স্ত্রী, পুত্র, আত্মীয় বা অনাত্মীয় ইত্যাদি। এমনি ভাবে যাহার তরফ হইতে এই সংকীর্ণতা প্রকাশ পাইবে তাহার অবস্থা ভেদেও হুকুম ভিন্ন হইবে। মোটকথা কৃপণ ঐ ব্যক্তি, যে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে ব্যয় করে না। চাই সেই প্রয়োজন শরীয়তের দৃষ্টিতে হউক অথবা মানবতার দৃষ্টিতে হউক। ইহার পরিমান নির্ধারণ করা মুসকিল। কৃপণতার সংজ্ঞা এই ভাবেও দেওয়া যাইতে পারে যে, যে উদ্দেশ্য মাল সংরক্ষণের তুলনায় অধিক গুরুত্বপূর্ণ ঐ উদ্দেশ্যে মাল খরচ না করাকে কৃপণতা বলা হয়। যেমন দ্বীনের হেফাজত মালের হেফাজতের তুলনায় গুরুত্বপূর্ণ। এমতাবস্থায় যে যাকাত আদায় করে না সে কৃপণ গন্য হইবে। এমনি ভাবে মানবতা বজায় রাখা মালের

হেফাজতের তুলনায় অধিক গুরুত্বপূর্ণ। অতএব যাহার ব্যাপারে সংকীর্ণতা করা সমীচীন নহে তাহার ব্যাপারে মালের ভালবাসায় সংকীর্ণতা করা কৃপণতা গণ্য হইবে। এই ক্ষেত্রে আরেকটি স্তর রহিয়াছে। সেইটি হইল, এক ব্যক্তি ওয়াজিব আদায় করে, চাই সেই ওয়াজিব শরীয়তের দৃষ্টিতে হউক অথবা মানবতার দৃষ্টিতে হউক। কিন্তু তাহার প্রচুর সম্পদ রহিয়াছে। ঐ সম্পদ হইতে দানখয়রাত করে না বা অভাব গ্রস্তদিগকে সাহায্য করে না। এমতাবস্থায় দুইটি উদ্দেশ্য পরস্পর বিরোধী হইয়াছে। একটি হইল মাল সংরক্ষণের উদ্দেশ্য বিভিন্ন বিপদাপদে মদদ গ্রহণের নিমিত্ত আরেকটি হইল আখেরাতে মর্যাদা বুলন্দ হওয়ার জন্য ছাওয়াব লাভের উদ্দেশ্য। এই শেষোক্ত উদ্দেশ্যে মাল খরচ না করা জ্ঞানীদের কাছে কৃপণতা যদিও জনসাধারণের কাছে কৃপণতা নহে। কারণ সাধারণ লোকের দৃষ্টিতে বিপদাপদে মদদ গ্রহণ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যেহেতু তাহাদের লক্ষ্য দুনিয়াবী স্বার্থের প্রতি সীমাবদ্ধ। তবে কখনও এই কৃপণতা সাধারণ লোকের কাছেও ধরা পড়ে। যেমন তাহার দরিদ্র প্রতিবেশীকে দান করণ হইতে বিরত রহিল এবং বলিল, আমি ওয়াজিব যাকাত আদায় করিয়া দিয়াছি এখন আমার উপর ওয়াজিব নাই। ইহা দোষনীয় বটে কিন্তু মালের পরিমান অভাবের প্রকটতা, অভাবগ্রস্ত ব্যক্তির দ্বীনদারিত্ব, তাহার অধিকার ইত্যাদি ভেদে উহার স্তরও বিভিন্ন রকম হইবে।

যে ব্যক্তি শরীয়ত ও মানবতার দায়িত্ব পালন করিয়াছে সে কৃপণতা মুক্ত হইয়া গিয়াছে। তবে মর্যাদা লাভের উদ্দেশ্যে যতক্ষণ ইহার অতিরিক্ত মাল খরচ না করিবে ততক্ষণ দানশীল গণ্য হইবে না। যে ক্ষেত্রে শরীয়তের নির্দেশও নাই অথবা খরচ না করা হইলে সাধারণতর তিরস্কারেরও আশংকা নাই, সেই ক্ষেত্রে উদারতার সহিত দান করিলে দানশীল গণ্য হইবে। আর এই দানশীলতার অসংখ্য স্তর রহিয়াছে। একজনের তুলনায় আরেকজন বেশী দানশীল হইয়া থাকে। মোটকথা শরীয়ত ও মানবতার তাগিদ ছাড়া যে ইহসান ও উপকার করা হয় উহাকে দানশীলতা বলে। তবে শর্ত হইল সন্তুষ্ট চিত্তে হইতে হইবে এবং ইহার বিনিময়ে খেদমত প্রতিদান, শোকরিয়া প্রশংসা ইত্যাদির আশা না থাকিতে হইবে। কেননা যে শোকরিয়া কৃতজ্ঞতা বা প্রশংসার আশা করে সে দানশলি নহে, সে আপন মালদ্বারা কৃতজ্ঞতা এবং প্রশংসা ক্রেতা। কারণ সে প্রশংসা খরিদ করিয়াছে, যাহা স্বতন্ত্র উদ্দেশ্য হইতে পারে। আর দানশীলতা বলা হয় কোন বিনিময় ব্যতিরেকে মাল খরচ করাকে। ইহা হইল প্রকৃত দানশীলতা ও বদান্যতা। এই বদান্যতা একমাত্র আল্লাহর পক্ষে সম্ভব। বান্দাকে যে দানশীল বলা হয় তাহা হইল রূপকার্থে প্রকৃত অর্থে নহে। কারণ বান্দা কোন জিনিস যে কোন এক উদ্দেশ্যে দান করিয়া থাকে। তবে তাহার উদ্দেশ্য যদি ছাওয়াব অথবা বদান্যতার মর্যাদা লাভ অথবা নফসকে কৃপণতার তুচ্ছতা হইতে পবিত্র করণ হয়, তবে তাহাকে দানশীল বলা হইবে। আর যদি ইহার কারণ হয় কুৎসার আশংকা, তিরস্কার অথবা দান গ্রহিতার পক্ষ হইতে কোন স্বার্থ লাভ হওয়া তবে ইহা দানশীলতা গণ্য হইবে না। কেননা সে এই সমস্ত কারণে দান করিতে বাধ্য

হইয়াছে। ইহাও একটি দুনিয়াবী প্রতিদান বিধান, সে দানশীল গণ্য হইবে না। বর্ণিত আছে, জনৈকা আবেদা মহিলা হাববান ইবনে হেলালের কাছে আসিল। হাব্বান তখন আপন সহচরগণকে লইয়া বসা ছিলেন। মহিলা আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, তোমাদের মধ্যে কে এমন আছে যাহার কাছে একটি মাসআলা জিজ্ঞাসা করিতে পারি? সকলেই হাব্বানের দিকে ইঙ্গিত করিল। মহিলা জিজ্ঞাসা করিল, আপনারা সাখা বা দানশীলতা বলিতে কি বুঝেন। তিনি উত্তরে বলিলেন, দান খয়রাত উদারতা ইত্যাদি। সে বলিল, ইহাতো দুনিয়া সম্পর্কিত সাখা, দ্বীন সম্পর্কিত সাখা কাহাকে বলে? হাব্বান উত্তরে বলিলেন, আল্লাহর ইবাদত স্বতঃস্ফুর্ত উদারচিত্তে করা, মনে কোন প্রকার চাপ অনুভব না করা। মহিলা জিজ্ঞাসা করিল, আপনারা ইহার দরুন কোন ছাওয়াবের আশা করেন কি? উত্তরে বলিলেন, হ্যাঁ, মহিলা জিজ্ঞাসা করিল কেন? হাব্বান বলিলেন, যেহেতু আল্লাহ তায়ালা আমাদিগকে এক নেকীর বদলে দশটি ছাওয়াব দানের ওয়াদা করিয়াছেন। মহিলা বলিল, সুবহানাল্লাহ। একটির বদলে দশটি গ্রহণ করিয়াছেন ইহা সাখা বা বদান্য হইল কি করিয়া? হাব্বান বলিলেন, তাহা হইলে আপনার মতে সাখা কাহাকে বলে? আল্লাহ আপনার প্রতি রহমত বর্ষণ করুন। মহিলা বলিল, আমার মতে দ্বীন সম্পর্কিত সাখা হইল, আল্লাহর ইবাদত এই ভাবে করা যে, অন্তরে স্বাদ অনুভব হইবে, কোন প্রকার চাপ অনুভব হইবে না, ছাওয়াব এবং প্রতিদানেরও আশা থাকিবে না। বরং আল্লাহর যাহা মর্জি তাহাই করিবেন। আপনারা কি আল্লাহকে লজ্জা করেন না যে, তিনি আপনাদের অন্তরের এই অবস্থা জানিয়া ফেলিবেন যে, এক জিনিষের পরিবর্তে আরেক জিনিষ চাহিতেছেন? ইহাতো দুনিয়ার ব্যাপারেও দোষনীয়।

জনৈকা আবেদা মহিলা সম্পর্কে বর্ণিত আছে, সে বলিল, তোমরা কি মনে কর সাখা ও বদান্যতা কেবল টাকা পয়সার ক্ষেত্রেই? তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল, আর কিসে হইতে পারে? সে উত্তরে বলিল, আমার মতে প্রাণ উৎসর্গকরা হইল সাখা বা বদান্যতা।

মুহাসিবী (রহঃ) বলেন, দ্বীন সম্পর্কিত সাখা হইল, স্বতঃস্ফূর্ত, উদারচিত্তে ও সন্তুষ্টচিত্তে আল্লাহর জন্য প্রান উৎসর্গ করিয়া দেওয়া এবং ইহার কোন পার্থিব বা পরলৌকিক প্রতিদানের আশা না করা। ছাওয়াবের প্রয়োজন যদিও রহিয়াছে তবে মনকে উদার রাখিতে হইবে এবং ছাওয়াবের বিষয়টিও আল্লাহর কাছে সোপর্দ করিয়া দিবে, অতএব আল্লাহ তায়ালাই বান্দার জন্য যেইটি উত্তম ও কল্যাণকর সেইটি করিবেন।

কৃপণতার চিকিৎসা

কৃপণতার কারণ হইল সম্পদ মোহ! আর এই সম্পদ মোহের কারণ দুইটি। একটি হইল ভোগবিলাসের খাহেশ স্পৃহা যাহা সম্পদ ব্যতিরেকে পূর্ণ করা সম্ভব নহে। এতদসত্ত্বে দীর্ঘজীবি হওয়ার আশা কেননা কোন ব্যক্তি যদি ইহা জানিতে পারে যে, একদিন পর সে মারা যাইবে তবে সে হয়ত মালের ব্যাপারে কৃপণতা

করিবে না। ইহার কারণ হইল, একদিন অথবা এক মাস কিংবা এক বৎসরের জন্য যে পরিমাণ মালের প্রয়োজন তাহা কমই। কেহ যদি দীর্ঘজীবি হওয়ার আশা নাও করে কিন্তু তাহার সন্তান সন্তুতি থাকে তবে ইহাও উক্ত দীর্ঘাশার স্থলাভিষিক্ত হইবে। কেননা সে নিজের মতই তাহাদের জন্য বাঁচিবার চিন্তা করতঃ সম্পদ সঞ্চয় করিবে। তাই রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলিয়াছেন- সন্তান কৃপণতা, কাপুরুষতা ও অজ্ঞতার কারণ। অতএব ইহার সহিত যখন দারিদ্রের ভয় এবং রিযিকের ব্যাপারে হাতাশা ভাব সংযুক্ত হইবে তখন নিঃসন্দেহে কৃপণতা আরো বাড়িয়া যাইবে।

দ্বিতীয় কারণ হইল স্বয়ং মালপ্রিয় হওয়া, কোন কোন লোক আছে তাহার এত মাল রহিয়াছে যে সারা জীবন স্বাভাবিক ভাবে খরচ করিলেও শেষ হইবে না বরং হাজার হাজার টাকা উদ্ধৃত্ত থাকিয়া যাইবে। সে বৃদ্ধ হইয়া গিয়াছে কোন সন্তান নাই, প্রচুর মাল জমা আছে তারপরও সে যাকাত আদায় করে না, অসুস্থ হইলে চিকিৎসা করায় না, সে টাকা পয়সার এত আসক্ত হইয়া পড়িয়াছে যে, টাকার মালিক হওয়া এবং টাকা হাতে থাকা দ্বারাই সে ভিন্ন একটা স্বাদ অনুভব করে। অতএব সে উক্ত মাল মাটির নীচে পুতিয়া রাখে অথচ সে জানে যে, মৃত্যুর পর উক্ত মাল বিনষ্ট হইয়া যাইবে অথবা তাহার শত্রুদের হস্তগত হইয়া যাইবে। এতদসত্ত্বেও এতটুকু বদান্যতা করিতে পারে না যে, উহা নিজে ভক্ষণ করিবে অথবা দুই এক পয়সা দান করিবে। ইহা মারাত্মক আধ্যাত্মিক ব্যাধি। যাহার চিকিৎসা সুকঠিন বিশেষতঃ বৃদ্ধাবস্থায়, ইহা এমন ব্যধি যাহার আরোগ্যের আশা করা যায় না। এইরূপ ব্যক্তির দৃষ্টান্ত হইল এমন যে, এক ব্যক্তি কাহারো প্রতি আসক্ত হইয়াছে। অতঃপর সেই প্রেমাস্পদের যে বার্তাবহ আছে তাহার প্রতিই আসক্ত হইয়া পড়িয়াছে। এবং প্রকৃত মাহবুবও প্রেমাস্পদকে ভুলিয়া গিয়াছে। টাকা পয়সা মুলতঃ প্রয়োজন মিটানোর মাধ্যম। টাকা পয়সা প্রিয় হইয়াছিল যেহেতু এই টাকা পয়সার মাধ্যমেই আসল প্রিয়বস্তু অর্থাৎ প্রয়োজন ও উদ্দেশ্য পর্যন্ত পৌঁছা যায়। কিন্তু এই টাকা এখন আসল প্রিয়বস্তুতে পরিণত হইয়া গিয়াছে। ইহা চরম বোকামি। এই টাকা পয়সা সোনারূপা এবং অন্য পাথরের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। হ্যাঁ পার্থক্য শুধু এতটুকু যে, ইহার দ্বারা প্রয়োজন সারা হয়। অতএব প্রয়োজন মিটিয়া গেলে যাহা অতিরিক্ত হইবে উহার আর পাথরের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। এই গুলি সম্পদ মোহের কারণ। আর প্রত্যেক রোগের চিকিৎসা উহার কারণের বিপরীত বস্তু। অতএব ভোগবিলাসের যে স্পৃহা আছে উহার চিকিৎসা হইবে অল্পে তুষ্টি ও সবর, দীর্ঘায়ূ কামনার চিকিৎসা হইবে অধিক পরিমানে মৃত্যুর স্মরণ, সমকালীন ব্যক্তিদের মৃত্যুর প্রতি ধ্যান, সম্পদ অর্জনে তাহাদের কষ্ট ক্লেশ, সম্পদ বিনষ্ট হওয়া ইত্যাদি বিষয়। আর সন্তানের প্রতি মন আকৃষ্ট হওয়ার চিকিৎসা হইবে এই চিন্তা করা যে, সৃষ্টিকর্তা যখন তাহাকে সৃষ্টি করিয়াছেন তখন সাথে সাথে তাহার রিযিকও সৃষ্টি করিয়াছেন। কত সন্তান আছে তাহারা পিতার মালের ওয়ারেছ হয় নাই অর্থাৎ উত্তরাধিকার সুত্রে পিতার নিকট হইতে কিছুই পায় নাই। তাহাদের অবস্থা,

যাহারা পাইয়াছে তাহাদের তুলনায় অনেক ভাল। আরো চিন্তা করিবে যে, যদি সন্তান ফাসেক হয়, তবে সে এই মালদ্বারা গোনাহর কাজে সাহায্য নিবে। আর সেই গোনাহর মুসীবত তাহাকে ভোগ করিতে হইবে। আর যদি সন্তান নেককার হয় তবে আল্লাহই তাহার জন্য যথেষ্ট। এমনিভাবে কৃপণতার নিন্দা ও শাস্তি সম্বলিত হাদীছ এবং দানশীলতার প্রশংসা সম্বলিত হাদীছ সমূহের ব্যাপারেও ধ্যান করিবে। আরেকটি ফলদায়ক চিকিৎসা হইল কৃপণদের অবস্থা সম্পর্কে চিন্তা করা, তাহাদিগকে মনে মনে ঘৃণা করা এবং খারাপ জানা। কেননা এমন কোন কৃপণ নাই যে, অন্যের কৃপণতাকে খারাপ না মনে করে। অতএব চিন্তা করিবে যে, আমার কাছে যেমন অন্যের কৃপণতা খারাপ লাগে আমার কৃপণতাও অন্যের কাছে খারাপ লাগিবে এবং আমিও অন্যান্যদের ন্যায় মানুষের দৃষ্টিতে ঘৃণিত হইব। আরো চিন্তা করিবে যে, মালের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কি, ইহা কিসের জন্য সৃষ্টি করা হইয়াছে। মাল প্রয়োজন পরিমাণ সংরক্ষণ করা চাই আর অতিরিক্ত মাল পারলৌকিক সুখ শান্তির জন্য সঞ্চয় করিয়া রাখা উচিৎ। এই সমস্ত চিকিৎসা হইল ইলম ও মারেফাতের দৃষ্টিকোন হইতে। যে জ্ঞানের আলো দ্বারা বুঝে যে, মাল সঞ্চয়ের চাইতে ব্যয় করা দুনিয়া আখেরাত উভয় ক্ষেত্রে উত্তম, সে ব্যয় করিতে উৎসাহিত হইবে। কিন্তু একটি বিষয় অবশ্যই মনে রাখিতে হইবে যে, এই ধরনের খেয়াল ও ধারনা সৃষ্টি হওয়ার সাথে সাথে খরচ করিয়া ফেলিতে হইবে, দেরি করা উচিৎ হইবে না কারণ শয়তান সর্বদা দারিদ্রের ভয় দেখাইয়া বিরত রাখিতে সচেষ্ট।

আবুল হাসান বুমেঙ্গী (রহঃ)-এর ঘটনা

আবুল হাসান বুমেঙ্গী(রহঃ)-এর ঘটনা তিনি একবার শৌচাগারে প্রবেশ করিলেন। ঐখানে থাকাবস্থায়ই জনৈক শাগরেদকে ডাকিয়া বলিলেন, আমার গায়ের কুর্তাটি খুলিয়া অমুককে দিয়া দাও। শাগরেদ বলিল, আপনি শৌচাগার হইতে বাহির হইয়াই লইতেন। তিনি বলিলেন, আমার নিজের ব্যাপারে আশংকা হইতেছে হয়তো আমার মনের অবস্থা পরে থাকিবে না। আমার মনে দান করার যে ইচ্ছা জাগিয়াছে ইহাকে কার্যকরী করা চাই। কেহ যদি কাহারো প্রতি আসক্ত হয় আর সেই আসক্তি হইতে মুক্তি পাইতে চায় তবে প্রথমতঃ তাহাকে কিছুটা কষ্ট করিয়া প্রেমাস্পদের জায়গা পরিত্যাগ করিতে হইবে। যখন দূরে সরিয়া যাইবে তখন ধীরে ধীরে মন শান্ত হইয়া যাইবে। অনুরূপভাবে কৃপনতা দূর করিতে চাহিলে প্রথমে কিছুটা জবরদস্তিমুলকই দান করিতে হইবে। ধীরে ধীরে কৃপণতা দূর হইয়া যাইবে এবং দানশীলতার গুণ আসিয়া যাইবে। এমনকি কৃপণতা দূরীভূত করার জন্য মাল পুঞ্জিভূত না করিয়া উহা পানিতে ফেলিয়া দেওয়া উত্তম। কৃপণতা দূরীভূত করার আরেকটি সুক্ষ্ম পন্থা হইল, প্রথমে নফসকে খ্যাতির লোভ দেখাইয়া দান করিতে থাকিবে। অতঃপর যখন কৃপণতার ব্যাধি দূরীভূত হইয়া যাইবে তখন রিয়া ও মর্যাদা মোহের চিকিৎসা শুরু করিবে। খ্যাতির এই প্রলোভন শুধু নফসকে সান্ত্বনা দিয়া তাহার গতি অন্য দিকে

ফিরানোর জন্য। যেমনিভাবে শিশুকে দুধ ছাড়ানোর জন্য পাখি ইত্যাদি দিয়া খেলায় লিপ্ত করা হয়, আসলে এই খেলা উদ্দেশ্য নহে। বরং তাহাকে সান্ত্বনা দান করতঃ তাহার মনোযোগ অন্য দিকে ফিরানোর উদ্দেশ্য, পরে অবশ্য তাহাকে অন্য দিকে ধাবিত করা হইবে। অনুরূপভাবে মন্দ চরিত্রগুলি একটিকে অপরটি দ্বারা চুরমার করিতে হইবে। যেমন শাহওয়াত দ্বারা ক্রোধের ক্ষিপ্রতাকে চুরমার করিতে হইবে, আবার ক্রোধের মাধ্যমে শাহওয়াতের শিথিলতাকে চুরমার করিতে হইবে। কৃপণতা দূরীভূত করার উপরোক্ত চিকিৎসা ঐ ব্যক্তিব জন্য ফলদায়ক যাহার কাছে কৃপণতা, খ্যাতি ও মর্যাদা মোহের চাইতে বেশী শক্তিশালী। এমতাবস্থায় সে দুর্বলটি গ্রহণ করতঃ শক্তিশালীটি দূরীভূত করিল। নচেৎ যদি উভয়টি সমপর্যায়ের হয় তবে ইহাতে কোন লাভ নাই, কারণ একটি ব্যাধি হইতে মুক্ত হইয়া অনুরূপ আরেকটিতে আক্রান্ত হইয়া পরিল। আর ইহা চিনিবার আলামত হইল, যদি খ্যাতি লাভের উদ্দেশ্যে দান করা তাহার কাছে কষ্টকর না হয়, তবে মনে করিবে রিয়া তাহার মধ্যে শক্তিশালী। আর যদি কষ্টকর মনে হয় তবে বুঝিতে হইবে রিয়া দুর্বল। এমতাবস্থায় দান ফলদায়ক হইবে।

মন্দ চরিত্র সমূহের একটিকে অপরটি দ্বারা দমন করার উদাহরণ হইল এইরূপ যে, মৃতদেহ পচিয়া যখন কীটে পরিণত হইয়া যায় তখন এক কীট অপর কীটকে খাইতে শুরু করে। খাইতে খাইতে শেষ পর্যন্ত দুইটি বড় কীট থাকিয়া যায়। অতঃপর এই দুইটি পরস্পরে লড়াই করতঃ কোন একটি জয়ী হইয়া অপরটিকে খাইয়া ফেলে। ইহার পর এই একটিও অনাহারে থাকিয়া পরিশেষে মারা যায়। অনুরূপ ভাবে এই সমস্ত মন্দ চরিত্রগুলি একটিকে অপরটি দ্বারা দমন করা যাইতে পারে। অবশেষে যখন মাত্র একটি বাকী থাকিয়া যাইবে তখন উহাকে ধ্বংস করার জন্য মুজাহাদা শুরু করিতে হইবে। আর সেইটি হইল খাদ্য হ্রাস করিয়া দেওয়া। চরিত্রের খাদ্য হ্রাস করার অর্থ হইল উহার নির্দেশ ও চাহিদা অনুযায়ী আমল না করা। কেননা সে অবশ্যই কোন না কোন একটি কাজ চাহিবে। যখন তাহার বিরোধিতা করা হইবে তখন দুর্বল হইয়া মারা যাইবে যেমন, কৃপণতা চায় মাল আটকাইয়া রাখিতে। এমতাবস্থায় যখন তাহার বিরোধিতা করতঃ মুজাহাদার সহিত বার বার মাল দান করা হইবে তখন কৃপণতার চরিত্র দূরীভূত হইয়া দানশীলতা প্রকৃতিগত গুনে পরিণত হইয়া যাইবে। তখন আর কষ্টও অনুভব হইবে না।

অতএব কৃপণতার চিকিৎসা দুইটি জিনিষ দ্বারা লাভ হইবে। ইলম ও আমল। ইলম বলিতে কৃপণতার অপকারিতা এবং দানশীলতার উপকারিতা সম্বন্ধে অবগত হওয়া। আর আমল বলিতে কিছুটা কষ্ট করিয়া লৌকিকতা স্বরূপ হইলেও মাল দান করা। তবে কৃপণতা কখনও এত প্রকট হয় যে, ইহা ব্যক্তিকে অন্ধ ও বধির করিয়া দেয়। তখন কৃপণতার অপকারিতা এবং দানশীলতার উপকারিতা বুঝে আসে না। যখন ইহা বুঝে আসে না, তখন আগ্রহও সৃষ্টি হয়

না। আর আগ্রহ সৃষ্টি না হইলে আমলেরও সুযোগ হয় না। তখন ইহা চিররোগ হিসাবে থাকিয়া যায়, যেমন কেহ এমন রোগে আক্রান্ত হইয়াছে যে তাহার ঔষধ চিনিবার ক্ষমতাই নাই। অতএব সে ঔষধ ব্যবহার করিবে কি করিয়া? এমন রোগীর মৃত্যুর অপেক্ষা ছাড়া আর কোন উপায় নাই।

সুফী সম্প্রদায়ের কেহ কেহ মুরীদদের কৃপণতা দূরীভূত করার জন্য এই পন্থা অবলম্বন করিতেন যে, তাহাদিগকে তাহাদের বিশেষ ও নির্ধারিত কোনে বেশীদিন থাকিতে দিতেন না। যদি কোন মুরীদকে দেখিতেন যে, সে কোন এক কোনে থাকিতে ভালবাসে তখন তাহাকে ঐ কোন হইতে সরাইয়া অন্য এক কোনে স্থানান্তর করিয়া দিতেন এবং আসবাব পত্র সব স্থানান্তর করিয়া দিতেন। এমন কি যদি দেখিতেন যে, কোন একটি নতুন কাপড় অথবা জায়নামায পাইয়া সে খুব খুশী হইয়া গিয়াছে তবে ইহা অন্যকে দিয়া দেওয়ার নির্দেশ দিতেন এবং তাহাকে পুরাতন কোন কাপড় ব্যবহার করিতে দিতেন যাহার প্রতি মন আকৃষ্ট না হয়।

উল্লেখিত পন্থায় অন্তর দুনিয়াবী সামগ্রী হইতে দূরে থাকিবে। যে ব্যক্তি এই পথ অবলম্বন করিবে না, সে দুনিয়াকে ভালবাসিতে শুরু করিবে। তাহার যদি সহস্র সামগ্রী থাকে তবে সহস্র প্রেমভাজন সৃষ্টি হইয়া যাইবে। তাই এগুলির কোন একটি যদি চুরি হইয়া যায় তবে উহার প্রতি যেই পরিমান ভালবাসা ছিল সেই অনুপাতে মুসীবত তাহার উপর আসিয়া পতিত হয়। আর যখন সে মারা যায় তখন তাহার উপর সহস্র মুসীবত আসিয়া পতিত হয়। যেহেতু সবগুলিই তাহার প্রিয় বস্তু ছিল আর সবগুলিই এখন একসাথে ছিনাইয়া নেওয়া হইতেছে। বরং জীবদ্দশায়ই বিনষ্ট হইয়া যাওয়ার কারণে এই ধরনের মুসীবতের সম্মুখীন হইতে পারে।

বর্ণিত আছে, কোন বাদশাহর কাছে একটি মনিমুক্তা খচিত ফিরূজা পাথরের পেয়ালা পেশ করা হইল। এমন পেয়ালা আর কেহ কখনও দেখে নাই বাদশাহ ইহা পাইয়া অত্যন্ত খুশী হইল এবং তাহার দরবারস্থ কোন একজন বিজ্ঞ ব্যক্তিকে বলিল, ইহা কেমন দেখিতেছ? সে বলিল, মুসিবত অথবা দারিদ্র মনে হইতেছে। বাদশাহ জিজ্ঞাসা করিল, কেন? ঐ ব্যক্তি বলিল, যদি ভাঙ্গিয়া যায় তবে ইহা আপনার জন্য বিরাট মুসিবতের কারণ হইবে। আর যদি চুরি হইয়া যায় তবে আপনি ইহার মুখাপেক্ষী ও অভাবগ্রস্থ এবং ইহার নজীর আর পাইবেন না। অথচ ইহা লাভের পূর্বে আপনি এই মুসিবত ও অভাবমুক্ত ছিলেন।

কিছুদিন অতিবাহিত হওয়ার পর ঘটনাক্রমে পেয়ালাটি ভাঙ্গিয়া গেল অথবা চুরি হইয়া গেল। ইহাতে বাদশাহর উপর বিরাট মুসিবত আসিয়া পড়িল। তখন বলিল, হাকীক (বিজ্ঞব্যক্তি) যাহা বলিয়াছিল তাহাই ঠিক। এই পেয়ালা যদি আমার কাছে না আসিত। আসলে দুনিয়ার প্রত্যেক বস্তুই এমন। দুনিয়াতো আল্লাহর দুশমনদেরও দুশমন। কেননা এই দুনিয়া তাহাদিগকেও জাহান্নামে লইয়া যায়। আর আল্লাহর ওলীগনের দুশমন হইল এই হিসাবে যে, এই দুনিয়ার

ব্যাপারে তাঁহাদিগকে সবর করিতে হয়। আর আল্লাহর দুশমন এই হিসাবে যে, এই দুনিয়া আল্লাহ দিকে পৌঁছার, বান্দাদের যে পথ রহিয়াছে ঐ পথ সে রুদ্ধ করিয়া দেয়। আর স্বয়ং নিজেই তাহার দুশমন এই হিসাবে যে, সে নিজেই নিজেকে ভক্ষন করে। কেননা মাল সংরক্ষনের জন্য পাহারাদার ও ধনাগারের প্রয়োজন হয়। আর এই দুইটি মাল ব্যতীত হাসিল করা সম্ভব নহে। অতএব এই মাল নিজেকে ভক্ষণ করত এবং স্ববিরোধিতা করত ধ্বংস হইয়া যায়। যে ব্যক্তি মালের আপদ সম্পর্কে জ্ঞাত সে কখনও মালের সহিত ভালবাসা স্থাপন করে না বা উহার কারণে খুশী হয় না। আর উহা গ্রহণ করিলেও কেবল প্রয়োজন পরিমান গ্রহণ করে। যে ব্যক্তি প্রয়োজন পরিমানে তুষ্ট থাকে সে কৃপণ হইবে না। কারণ প্রয়োজন পরিমান মাল সঞ্চয় করা কৃপণতা নহে। আর প্রয়োজনাতিরিক্ত মাল রাখা যেহেতু ঝামেলা মুক্ত নহে, তাই ইহা সংরক্ষনের কষ্ট না ভোগ করিয়া দান করিয়া দিবে। অবস্থাতো এমন যে, এক ব্যক্তি দজলা নদীর তীরে বসিয়া মানুষকে নদীর পানি দান করিতেছে। এমন ব্যক্তি নিজ প্রয়োজনাতিরিক্ত পানি দান করিতে যেমন কোন প্রকার কুণ্ঠাবোধ করিবে না অনুরূপ ভাবে ঐ ব্যক্তিও প্রয়োজনাতিরিক্ত মাল দান করিতে কুণ্ঠাবোধ করিবে না।

মাল সম্পর্কে জরুরী নির্দেশনা পূর্বে বর্ণনা করা হইয়াছে যে, মাল এক হিসাবে ভাল আরেক হিসাবে মন্দ। তাহার দৃষ্টান্ত হইল বিষাক্ত সর্প। সাপুড়িয়া সাপ ধরে উহার ভিতর হইতে তিরয়াক অর্থাৎ বিষনাশক পদার্থ বাহির করার উদ্দেশ্যে। আর অজ্ঞ ব্যক্তি ধরিয়া উহার দংশনে ও বিষ ক্রিয়ায় মারা যায়। অথচ সে বুঝিতেও পারে না। কোন ব্যক্তিই পাঁচটি নির্দেশনা ব্যতীত মালের বিষক্রিয়া হইতে রক্ষা পাইবে না। নির্দেশনা সমূহ হইল এই-

একঃ মালের উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবগত হইতে হইবে যে, এই মাল কি জন্য সৃষ্টি করা হইয়াছে এবং ইহার প্রয়োজন কেন? ইহা জানা থাকিলে প্রয়োজনাতিরিক্ত মাল অর্জনও করিবে না এবং সংরক্ষণও করিবে না। আর যে ব্যক্তি প্রাপ্যের অধিক চায় তাহাকে দিবে না।

দুইঃ মাল উপার্জনের পন্থার প্রতি লক্ষ্য রাখিবে। অতএব নিছক হারাম বর্জন করিবে। যে মাল অধিকাংশ হারাম হইয়া থাকে যেমন শাহী মাল ইহাও বর্জন করিবে। এমনিভাবে মাকরূহ পন্থা যা দ্বারা সম্ভ্রম বিনষ্ট হয় ইহা বর্জন করিবে। যথা ঘুষের সম্ভাবনাপূর্ণ হাদিয়া, এমন সওয়াল যাহাতে লাঞ্ছনা ও সম্ভ্রমহানি রহিয়াছে ইত্যাদি।

তিনঃ উপার্জিত মালের পরিমানের প্রতি লক্ষ্য রাখিবে। অতএব বেশীও উপার্জন করিবে না আবার কমও উপার্জন করিবে না। বরং অপরিহার্য পরিমান উপার্জন করিবে। আর ইহার মাপকাঠি হইল অন্নবস্ত্র ও বাসস্থানের প্রয়োজনীয়তা, ইহাদের প্রত্যেকটিরই তিনটি করিয়া স্তর রহিয়াছে। উচ্চ, মধ্যম ও নিম্ন। যতক্ষণ পর্যন্ত অল্পের দিকে ঝুঁকিয়া থকিবে এবং অপরিহার্য পরিমানের

কাছাকাছি থাকিবে ততক্ষন ভাল থাকিবে এবং হক পন্থীদের শ্রেনীভুক্ত থাকিবে। আর যখন এই সীমা লঙ্ঘন করিয়া ফেলিবে তখন অতলগর্ভে পড়িয়া যাইবে। ইতিপূর্বে যুহ্‌দ অধ্যায়ে এতদ সম্পর্কিত বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে।

চারঃ ব্যয় খাতের প্রতি লক্ষ্য রাখিবে। অতএব ব্যয়ের ব্যাপারে পরিমিত ও সরল পন্থা অবলম্বন করিবে। কৃপণতাও করিবে না অপব্যয়ও করিবে না। আর হালাল পন্থায় উপার্জিত মাল হক ও বৈধ পথে ব্যয় করিবে নাহক ও অবৈধ পথে নহে। কেননা নাহক ও অবৈধ পন্থায় উপার্জন ও অবৈধ পথে ব্যয় উভয়টিই সমপর্যায়ের গোনাহ।

পাঁচ ঃ মালবরণ বর্জন ও ব্যয় সঞ্চয় প্রত্যেক ক্ষেত্রেই নিয়ত সঠিক রাখিবে। অতএব যাহা গ্রহন করিবে তাহা ইবাদতের সাহায্য গ্রহণার্থে গ্রহণ করিবে আর যাহা বর্জন করিবে তাহা উহার প্রতি অনাসক্তি ও অনীহা প্রকাশার্থে বর্জন করিবে। এমন করিতে পারিলে মাল আর কোন ক্ষতি করিতে পারিবে না। তাই হ্যরত আলী (রাদিঃ) বলিয়াছেন, কেহ যদি সমগ্র পৃথিবীর মালের অধিকারীও হইয়া যায় আর তাহার উদ্দেশ্য থাকে, ইহা দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন তবে তাহাকে যাহেদ বা দুনিয়া বিরাগীই বলা হইবে। পক্ষান্তরে যদি সব কিছু বর্জন করিয়া দেয় কিন্তু ইহা দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি উদ্দেশ্য না থাকে তবে সে যাহেদ নহে। অতএব আপনার যাবতীয় কাজকর্ম আল্লাহর জন্যই হওয়া চাই। অর্থাৎ সরাসরি আল্লাহর ইবাদত হইবে অথবা ইবাদতের সহায়ক হইবে। মানুষের কাজ কর্মের মধ্যে ইবাদত হইতে সব চাইতে দূরবর্তী হইতেছে পানাহার ও মলত্যাগ করা। এই দুইটিও ইবাদতের সহায়ক হইতে পারে। কেহ যদি এই দুইটি কাজ ইবাদতের সহায়ক নিয়ত করিয়া করে তবে এই দুইটিও ইবাদতে গন্য হইবে। এমনিভাবে প্রত্যেক ব্যবহারিক বস্তু যথা- জামা, লুঙ্গি, বিছানা, থালা-বাসন এইগুলির ক্ষেত্রে ও অনুরূপ নিয়ত থাকা চাই। কেননা এইগুলিও দ্বীনের ব্যাপারে সহায়ক ও প্রয়োজনীয় বস্তু। আর যে জিনিষ প্রয়োজনাতিরিক্ত হয় উহার ব্যাপারে এই নিয়ত রাখিবে, ইহা কোন আল্লাহর বান্দার প্রয়োজনে আসিবে। তাই কেহ যদি প্রয়োজনে এমন কোন জিনিষ চায় তবে দিতে অস্বীকার না করা চাই। যে ব্যক্তি এই সমস্ত বিষয় স্বীয় কর্মবিধি হিসাবে গ্রহন করিয়া লইবে সে যেন উহার ভিতর হইতে বিষনাশক বস্তু বাহির করিয়া লইল এবং বিষ ফেলিয়া দিল। কিন্তু ইহা ঐ ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব যে ইলমে দ্বীনের পরিপক্ক আলেম ও পাক্কা দ্বীনদার। পক্ষান্তরে কোন মুর্খ ব্যক্তি যদি ইহা ভাবিয়া মাল সঞ্চয় করে যে, কতক সাহাবায়েকেরাম ও মাল সঞ্চয় করিয়াছেন। তাই আমিও সঞ্চয় করি তবে তাহার অবস্থা ঐ ব্যক্তির ন্যায় হইবে যে, সাপের মন্ত্রসম্পর্কে অজ্ঞ ঐ ব্যক্তি মন্ত্রবিজ্ঞ ব্যক্তিকে সাপ ধরিতে এবং উহার বিষদাঁত ভাঙ্গিতে এবং উহার ভিতর হইতে বিষনাশক বস্তু বাহির করিতে দেখিয়া নিজেও ঐ কাজ শুরু করিয়া দিল। এই ব্যক্তির মৃত্যু অনিবার্য। তবে পার্থক্য এতটুকু যে, সর্পদংশিত ব্যক্তির মৃত্যু দৃশ্যতঃ অনুভব হয়। আর দুনিয়া দংশিত ব্যক্তির মৃত্যু দৃশ্যতঃ অনুভব হয় না। সাপকে দুনিয়ার সহিত তুলনা করতঃ কোন কবি বলিয়াছেন।

"দুনিয়া এমন সর্প যাহা মুখ হইতে বিষ নিঃসরণ করে যদিও তাহার শরীর কোমল।"

কোন অন্ধ ব্যক্তি যেমনি ভাবে পাহাড়ে আরোহন করা নদীর তীর ও কণ্টকময় স্থান দিয়া গমন করার ক্ষেত্রে দৃষ্টিশক্তিমান ব্যক্তির সমকক্ষতা করিতে পারে না। তদ্রুপ কোন মুর্খও মাল সঞ্চয়ের ক্ষেত্রে কোন আলেমের সমকক্ষতা লাভ করিতে পারে না। .

ধনবত্তার নিন্দা ও দারিদ্রের প্রশংসা

কৃতজ্ঞ ধনী উত্তম নাকি সবরকারী দরিদ্র উত্তম, এই সম্পর্কে আলেমগনের মতপার্থক্য রহিয়াছে। এই বিষয়ে যুহ্‌দ অধ্যায়ে আলোচনা করা হইয়াছে। তবে এই অধ্যায়ে অবস্থা ভেদ ব্যতিরেকেই ধনীর তুলনায় দরিদ্র উত্তম, এই বিষয়টি প্রমান করিব। আর এই ক্ষেত্রে মুহাসিবী (রহঃ) এর একটি আলোচনা আনয়ন করিব। এই আলোচনা তিনি কতিপয় ধনবান আলেমের জবাবে করিয়াছেন। যাহারা বিত্তশালী সাহাবা এবং হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আউফ (রাদিঃ) এর ধন প্রাচুর্যের মাধ্যমে দলীল পেশ করিয়া থাকেন। হারেছ মুহাসিবী (রহঃ) মুয়ামালা বা লেনদেন সম্পর্কিত শাস্ত্রে বিশারদ ছিলেন নফসের দোষত্রুটি, আমলের আপদ ও ইবাদতের গূঢ়তত্ত্ব সম্পর্কে তিনি যাহা লিখিয়াছেন আর কেহ তাহা লিখেন নাই। তাঁহার কথাগুলি এই ক্ষেত্রে খুবই উল্লেখযোগ্য। তিনি লিখিয়াছেন, বর্ণিত আছে যে, হযরত ঈসা (আঃ) বিশিষ্ট আলেমদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিয়া ছিলেন, হে আলেম সম্প্রদায়। তোমরা নামায পড়, রোযা রাখ এবং সদকা কর। কিন্তু যে বিষয়ের হুকুম তোমাদিগকে দেওয়া হইয়াছে তাহা তোমরা করনা আর নিজে যাহা করনা মানুষকে তাহা করিবার জন্য বল। তোমাদের এই কাজ অত্যন্ত মন্দ। তোমরা মুখে তৌবা কর আর নফসানী খাহেশ অনুযায়ী কাজ কর। তোমরা যদি বাহ্যিক দেহ পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখ আর অন্তর অপবিত্র থাকে তবে ইহা কোন উপকারে আসিবে না। তোমরা চালনির মত হইও না যে, ভাল আটা পড়িয়া যায় আর ভুসিগুলি কেবল উহাতে থাকিয়া যায়। বস্তুতঃ তোমরা এমনই যে, তোমাদের মুখ হইতে হেকমত ও জ্ঞানের কথা বাহির হয় কিন্তু তোমাদের অন্তর ময়লাযুক্ত। হে দুনিয়ার বান্দারা! যে ব্যক্তি দুনিয়ার ভালবাসা ও আগ্রহ ছিন্ন করিবে না, সে কিরূপে আখেরাত পাইতে পারে? আমি সত্য বলিতেছি, তোমাদের আমলের কারণে তোমাদের অন্তর রোদন করিতেছে। তোমরা দুনিয়াকে জিহ্‌বার নীচে আর আমলকে পদতলে স্থান দিয়াছ। তোমরা স্বীয় আখেরাতকে বরবাদ করিয়া দিয়াছ। দুনিয়ার স্বার্থকে আখেরাতের স্বার্থের তুলনায় অগ্রাধিকার দিয়াছ। তোমরা যদি জানিতে তোমাদের মধ্যে কে উত্তম। তোমরা আর কতদিন পথহারাদিগকে পথ দেখাইবে আর নিজেরা বিভ্রান্ত অবস্থায় পড়িয়া থাকিবে? মনে হয় যেন তোমরা মানুষকে দুনিয়া বর্জন করাইতেছ এই জন্য যে, ধীরে ধীরে তোমরা উহার মালিক হইয়া যাইবে। অন্ধকার ঘরের ছাদের উপর প্রদীপ রাখা হইলে কোন লাভ হইবে কি?

অনুরূপ ভাবে তোমাদের অন্ধকারাচ্ছন্ন থাকা অবস্থায় শুধু মুখে ইলমের নূর থাকাতে কোন উপকার হইবে না। হে দুনিয়ার গোলামেরা। তোমরা খোদাভীরুও নও সম্ভ্রান্তও নও। হয়ত দুনিয়া তোমাদিগকে অচিরেই মূলোৎপাটিত করিয়া উপুড় করিয়া নিক্ষেপ করিয়া দিবে, অতঃপর টানিয়া হেঁচড়াইয়া নিতে থাকিবে। তারপর তোমাদের গোনাহ্ তোমাদের মাথার চুঁটি ধারন করিয়া আর ইলম পিছনের দিক হইতে ঠেলিয়া মহান বিচারপতি আল্লাহর সমীপে একাকী ও বস্ত্রহীন অবস্থায় হাজির করিবে। অতঃপর তিনি তোমাদিগকে স্বীয়মন্দ আমল সম্পর্কে অবহিত করতঃউহার প্রতিদান ও শাস্তি দিবেন।

অতঃপর হারেছ মুহাসিবী (রহঃ) বলেন, ইহারা হইতেছে উলামায়ে সু বা মন্দ আলেম, মানব শয়তান এবং মানব জাতির জন্য ফেতনার কারণ। ইহারা দুনিয়া অনুরাগী, দুনিয়ার উন্নতি ইহাদের কাম্য, তাই ইহারা দুনিয়াকে আখেরাতের তুলনায় অগ্রাধিকার দিয়াছে, দুনিয়ার জন্য দ্বীনকে তুচ্ছ করিয়াছে। ইহারা দুনিয়াতে লাঞ্ছিত ও অপমানিত আর আখেরাতে ক্ষতিগ্রস্ত। হ্যাঁ, যদি মহান করুনাময় আল্লাহ আপন অনুগ্রহে ক্ষমা করিয়া দেন তবে ভিন্ন ব্যাপার।

যে ব্যক্তি দুনিয়াতে নিমগ্ন থাকিয়া দুনিয়াকে আখেরাতের তুলনায় অগ্রাধিকার দেয় আমি দেখিতে পাইয়াছি এমন ব্যক্তির খুশি মলিনতা পূর্ণ, সে নানা রকম চিন্তা ও গোনায় লিপ্ত। তাহার পরিনাম ধ্বংস বৈ আর কিছু নহে। দুনিয়াদার কোন এক আশায় আনন্দিত হয়, কিন্তু সে পরিশেষে না দুনিয়া পায় না আখেরাত।

خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَٰلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ -

"দুনিয়া আখেরাত উভয় ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্ত আর ইহাই হইতেছে সুস্পষ্ট ক্ষতি।"

উপরোক্ত আয়াতের বাস্তব নমুনা ইহারাই। এমন বিপদের চাইতে বড় বিপদ কি হইতে পারে ? অতএব হে ভাইয়েরা তোমরা শয়তান ও তাহার বন্ধুদের প্রবঞ্চনায় পড়িওনা যাহারা এমন বাতিল দলীলের শরনাপন্ন হইয়াছে যাহা আল্লাহর কাছে বাতিল ও অগ্রাহ্য ইহারা দুনিয়া অর্জনে লিপ্ত থাকে আর দলীল স্বরূপ বলে যে, সাহাবায়েকেরাম মাল সঞ্চয় করিয়াছেন। ইহা এই জন্য বলে যাহাতে মানুষ তাহাদিগকে মাল সঞ্চয়ের জন্য ভর্ৎসনা ও গঞ্জনা না করে। মূলতঃ ইহা শয়তানের ধোঁকা ও ওয়াসওয়াসা কিন্তু তাহারা অনুভব করিতে পারিতেছে না। হে শয়তান কর্তৃক প্রবঞ্চিত। তুমি যে আব্দুর রহমান ইবনে আউফ (রাদিঃ) -এর সম্পদ দ্বারা প্রমাণ পেশ করিতেছ ইহা আসলে শয়তানের ধোঁকা। শয়তান তোমার মুখ দিয়া এই কথা বাহির করিতেছে যাহাতে তুমি ধ্বংস হইয়া যাও। কেননা তুমি যখন বিশিষ্ট সাহাবীগন সম্বন্ধে এই ধারনা পোষণ করিতেছ যে, তাহারা ধনবান হওয়ার উদ্দেশ্যে এবং সম্মান ও মর্যাদা লাভের উদ্দেশ্যে সম্পদ অর্জন করিয়াছেন। তখন তুমি তাঁহাদের প্রতি জঘন্য বিষয়ের সম্বন্ধ করিয়াছ।

তুমি যখন এই কথা মনে করিয়াছ যে মাল বর্জন করার চাইতে অর্জন করা উত্তম। তখন মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এবং অন্যান্য সমস্ত নবী রাসূলকে কলঙ্কিত করিয়াছ। তোমার অবস্থান অনুযায়ী মাল সঞ্চয়ের প্রতি তোমার যেমন আগ্রহ রহিয়াছে, তাঁহাদেরও অনুরূপ আগ্রহ ছিল ইহাতে তাঁহাদের প্রতি অজ্ঞতার সম্বন্ধ করা হইতেছে। অথচ তাঁহারা তোমার ন্যায় মাল সঞ্চয় করেন নাই। তুমি যখন এই ধারনা করিতেছ যে, হালাল মাল সঞ্চয় করা উত্তম তখন তুমি যেন এই কথা বুঝাইতেছ যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উম্মতের মঙ্গল কামনা করেন নাই। কেননা তিনি মানুষকে মাল সঞ্চয় করিতে নিষেধ করিয়াছেন। অথচ তাঁহার জানা ছিল যে, মালসঞ্চয় করা তাহাদের জন্য উত্তম। অতএব তোমার ধারনা অনুযায়ী রাসূল্লাল্লাহ (সাল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উম্মতকে ধোঁকা দিয়াছেন (নাউযুবিল্লাহ) তাহাদের সহিত শুভাকাঙ্খীসুলভ আচরণ করেন নাই। তুমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) -এর প্রতি মিথ্যা আরোপ করিয়াছ। তিনি উম্মতের প্রতি পরম হিতাকাঙ্খী ও অনুগ্রহশীল ছিলেন। তোমার ধারনা মতে মাল সঞ্চয় করা যেহেতু উত্তম তাই তোমার ধারনা অনুযায়ী আল্লাহ তায়ালা মালসঞ্চয় উত্তম হওয়া সত্ত্বেও আপন বান্দাকে মাল সঞ্চয়ে নিষেধ করতঃ তাহাদের প্রতি (নাউযুবিল্লাহ) অহিতকর আচরণ করিয়াছেন অথবা তোমার ধারনা অনুযায়ী মালসঞ্চয় করা যে উত্তম ইহা আল্লাহ তায়ালা জানেন না। তাই নিষেধ করিয়াছেন। আল্লাহ তায়ালা অজ্ঞতা হইতে সম্পূর্ণ পবিত্র। হে হতভাগা! তুমি চিন্তা কর। মূলতঃ শয়তান তোমাকে ধোঁকা দিয়াছে। তাই তুমি সাহাবায়ে কেরামের মালসঞ্চয়ের বিষয়কে দলীল স্বরূপ পেশ করিয়াছ। আব্দুর রহমান ইবনে আউফ (রাদিঃ) -এর মালকে যে তুমি প্রমাণ হিসাবে গ্রহণ করিয়াছ ইহা তোমার কোন কাজে আসিবে না। কেননা তিনি কেয়ামতের দিন আকাঙ্খা করিবেন, হায়। দুনিয়াতে যদি আমি জীবন ধারন পরিমান খাদ্যলাভ করিতাম। বর্ণিত আছে, আব্দুর রহমান ইবনে আউফ (রাদিঃ) এর ইন্তিকালের পর কতক সাহাবী বলিলেন, আব্দুর রহমান ইবনে আউফ (রাদিঃ) যে সম্পদ রাখিয়া গিয়াছেন, সেজন্য আশংকা বোধ হইতেছে। তখন কাব (রাদিঃ) বলিলেন, তোমরা তাহার জন্য আশংকাবোধ করিতেছ কেন? সে হালাল মাল উপার্জন করিয়াছে, হালাল পন্থায় ব্যয় করিয়াছে এবং হালাল মাল পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে। এই খবর আবু যর (রাদিঃ) এর নিকট পৌঁছিলে তিনি রাগান্বিত হইয়া কাব (রাদিঃ) -এর উদ্দেশ্যে বাহির হইলেন। পথিমধ্যে উটের চোয়ালের একটি হাড় পাইলেন। ঐটি হাতে করিয়া কাব (রাদিঃ) -এর উদ্দেশ্যে চলিলেন। কাব (রাদিঃ) কে যখন এই সংবাদ জানানো হইল তখন তিনি পালাইয়া হযরত উছমান (রাদিঃ) এর কাছে যাইয়া আশ্রয় নিলেন। আবু যর (রাদিঃ) ও তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া উছমান (রাদিঃ) এর বাড়ীতে যাইয়া পৌঁছিলেন। কাব (রাদিঃ) আবুযর (রাদিঃ) কে দেখিয়া হযরত উছমান (রাদিঃ) এর পিছনে যাইয়া বসিলেন। আবু যর (রাদিঃ) কা'ব (রাদিঃ) কে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, হে ইহুদী সন্তান! তুমি নাকি বল যে,

আব্দুর রহমান ইবনে আউফ (রাদিঃ) যে সম্পদ রাখিয়া গিয়াছেন উহাতে কোন অসুবিধা নাই? আমি একদা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) -এর সহিত উহুদ পাহাড়ের দিকে যাইতে ছিলাম। (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলইহি ওয়াসাল্লাম) আমাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, হে আবু যর। আমি বলিলাম লাব্বাইক (আমি হাজির)। তিনি বলিলেন, অধিক সম্পদশালীরা কেয়ামতের দিন স্বল্প সম্পদের অধিকারী হইবে, তবে যে ব্যক্তি ডান দিক হইতে, বাম দিক হইতে, সম্মুখ হইতে পিছন হইতে খরচ করে[১] আর এমন লোক খুব কম। অতঃপর বলিলেন, হে আবু যর। আমার উহুদ পাহাড় পরিমান সম্পদ হউক আর আমি সব কিছু আল্লাহর পথে খরচ করিয়া ফেলি অতঃপর মৃত্যুকালে আমার কাছে কেবল দুই ক্বিরাত[২] মাল থাকুক ইহাও আমার নিকট পছন্দনীয় নহে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম। দুই কিনতার (স্তুপ) তিনি বলিলেন, না, দুই ক্বীরাত। ইহার পর বলিলেন, হে আবু যর! তুমিতো বেশী বুঝাইতে চাহিতেছ অথচ আমি কম বুঝাইতে চাহিতেছি। দেখ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) -এর উদ্দেশ্য হইল এই, আর তুমি ইহুদী সন্তান বলিতেছ আব্দুরহমান ইবনে আউফ (রাদিঃ) যে মাল রাখিয়া গিয়াছেন ইহাতে কোন অসুবিধা নাই। তুমি মিথ্যা বলিয়াছ আর যে এই রূপ বলে সেও মিথ্যা বলে। কাব (রাদিঃ) ভয়ে তাঁহার কথার কোন উত্তর না দিয়া বাহির হইয়া চলিয়া গেলেন।

একদা ইয়ামন হইতে আব্দুর রহমান ইবনে আউফ (রাদিঃ) এর এক তেজারতী কাফেলা আসিয়া পৌছিলে, মদীনায় রব পড়িয়া যায় আয়েশা (রাদিঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহা কিসের আওয়াজ। উত্তরে বলা হইল, আব্দুর রহমান ইবনে আউফের বনিকদল আসিয়াছে। তখন হযরত আয়েশা (রাদিঃ) বলিলেন, আল্লাহ এবং তাঁহার রাসূল (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সঠিক বলিয়াছেন, এই সংবাদ আব্দুর রহমান ইবনে আউফ (রাদিঃ) -এর কাছে পৌছিলে তিনি হযরত আয়েশা (রাদিঃ) কে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন, তখন হযরত আয়েশা (রাদিঃ) বলিলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে বলিতে শুনিয়াছি, তুমি যদি জান্নাত দেখিতে পাও, তবে দরিদ্র মুহাজির ও মুসলমানদিগকে দ্রুত জান্নাতে প্রবেশ করিতে দেখিবে। আব্দুর রহমান ইবনে আউফকে ছাড়া অন্যকোন ধনী ব্যক্তিকে তাহাদের সহিত প্রবেশ করিতে দেখিবে না। সে তাহাদের সহিত হামাগুড়ি দিয়া প্রবেশ করিবে। তখন আব্দুর রহমান ইবনে আউফ (রাদিঃ) বলিলেন, আমার এই কাফেলার সমস্ত মাল আল্লাহর পথে দান করিয়া দিলাম এবং আমার সমস্ত গোলাম বাঁদী আযাদ করিয়া দিলাম যাহাতে তাহাদের সহিত দ্রুত জান্নাতে প্রবেশ করিতে পারি।

এই সম্পর্কে আমাদের কাছে আরো হাদীছ পৌছিয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আব্দুর রহমান ইবনে আউফ (রাদিঃ) কে বলিলেন, তুমি আমার উম্মতের ধনীদের মধ্য হইতে সর্ব প্রথম জান্নাতে প্রবেশ করিবে তবে হামাগুড়ি দিয়া চলিবে। (সোজা চলিতে পারিবে না।)

টীকা (১) অর্থাৎ আল্লাহর পথে খুব দানখয়রাত করে।
(২) ক্বীরাত এক দেরহামের বার ভাগের একভাগ সমান ওজন।

হে হতভাগা! মাল সঞ্চয়ের ব্যাপারে তোমার প্রমান কোথায়? এই আব্দুর রহমান ইবনে আউফ (রাদিঃ) তাকওয়া পরহেযগারী, দান খয়রাত করা সত্ত্বেও এবং রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) -এর বিশিষ্ট সাহাবী এবং জান্নাতের সুসংবাদ প্রাপ্ত হওয়া সত্ত্বেও মালের দরুন কেয়ামতের ময়দানে তাহাকে দাঁড়াইয়া থাকিতে হইবে অথচ তিনি হালাল পন্থায় মাল উপার্জন করিয়াছেন, মিতব্যয় করিয়াছেন, আল্লাহর পথে খরচ করিয়াছেন, এতদসত্ত্বেও তিনি দরিদ্র মুহাজিরদের সহিত দ্রুতগতিতে জান্নাতে প্রবেশ করিতে পারিবেন না বরং পিছনে পিছনে হামাগুড়ি দিয়া চলিবেন। এখন আমাদের মত দুনিয়াদারদের সম্বন্ধে তোমার কি ধারনা? হে হতভাগা! তুমি হারাম ও শুবাহ সন্দেহযুক্ত মাল সঞ্চয়ে লিপ্ত, মানুষের ময়লার জন্য জবরদস্তি কর, শাহওয়াত সাজসজ্জা, গর্ব ও দুনিয়ার নানারকম ফেতনায় লিপ্ত রহিয়াছ আবার আব্দুর রহমান ইবনে আউফকে (রাদিঃ) প্রমাণ হিসাবে পেশ কর যে, সাহাবায়ে কেরাম মাল সঞ্চয় করিয়াছেন তাই আমিও করি। তুমিতো নিজেকে সলফগনের সমকক্ষ মনে করিতেছ। হে কমবখ্‌ত। এইটি হইল শয়তানের যুক্তি এবং আপন বন্ধুদের প্রতি তাহার ফতোয়া। আমি তোমার অবস্থা এবং সলফের অবস্থা তোমার সম্মুখে বর্ণনা করিব, যা দ্বারা তুমি নিজের অসারতা এবং সাহাবায়ে কেরামের উৎকর্ষতা উপলব্ধি করিতে পার। সাহাবায়ে কেরামের কতক এমন ছিলেন যে, তাঁহারা মাল সঞ্চয় করিয়াছিলেন মানুষের কাছে হাত পাতা হইতে বাঁচিয়া থাকার জন্য এবং আল্লাহর পথে খরচ করার উদ্দেশ্যে। তাঁহারা হালাল পন্থায় হালাল মাল উপার্জন করিয়াছেন, হালাল মাল ভক্ষণ করিয়াছেন, মিতব্যয় করিয়াছেন, অতিরিক্ত সম্পদ আল্লাহর পথে ব্যয় করিয়াছেন। তাহারা মালের কোন হক অনাদায় রাখেন নাই, কোন প্রকার কৃপণতা করেন নাই বরং অধিকাংশ সম্পদ আল্লাহর পথে দান করিয়া দিয়াছেন আর কতক সম্পূর্ণ সম্পদ দান করিয়া দিয়াছেন। মুসীবতের সময় আল্লাহকে নিজের উপর অগ্রাধিকার দিয়াছেন। আল্লাহর কসম দিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছি তুমি কি তাঁহাদের মত এমন গুনাবলীর অধিকারী। আল্লাহর কসম তুমি তাঁহাদের কাছেও নও, অধিকন্তু বিশিষ্ট_সাহাবীগণ দরিদ্রকে ভালবাসিতেন দারিদ্রের ভয় হইতে মুক্ত ছিলেন, রিযিকের ব্যাপারে আল্লাহর উপর নির্ভরশীল ছিলেন, তকদীরের প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন, বিপদে রাজি ও খুশী থাকিতেন, আনন্দে ও সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে কৃতজ্ঞ থাকিতেন, অভাব অনটনে ধৈর্য ধারন করিতেন, খুশীর অবস্থায় আল্লাহর প্রশংসা করিতেন, তাঁহারা আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে বিনয় অবলম্বন করিতেন, গর্বও বড়াই হইতে দূরে থাকিতেন। তাঁহারা দুনিয়া হইতে হালাল জিনিসই গ্রহণ করিয়াছেন, প্রয়োজন পরিমানের প্রতি সন্তুষ্ট রহিয়াছেন। দুনিয়াকে পদাঘাত করিয়াছেন, দুনিয়ার দুঃখ কষ্ট সহ্য করিয়াছেন এবং নেয়ামত ও চাকচিক্য বর্জন করিয়াছেন, আল্লাহর কসম তুমি কি এমন ?

আমরা আরো জানিতে পারিয়াছি যে, সাহাবায়ে কেরামের কাছে যখন মাল আসিত তখন তাঁহারা চিন্তাযুক্ত হইয়া পড়িতেন এবং বলিতেন, মনে হয় যেন কোন গোনাহর শাস্তি দুনিয়াতেই আল্লাহ তায়ালা দিয়া দিয়াছেন। অর্থাৎ দুনিয়ার

আগমনকে তাঁহারা আযাব এবং বিপদ মনে করিতেন। পক্ষান্তরে যখন দারিদ্র আসিতে দেখিতেন, তখন বলিতেন খোশ আমদেদ হে নেককারদের প্রতীক। আমরা আরো জানিতে পরিয়াছি যে, তাঁহাদের কেহ এমন ছিলেন যে, সকালে যদি ঘরে কিছু মাল দেখিতে পাইতেন তবে চিন্তাযুক্ত হইয়া পড়িতেন আর যদি কিছু না দেখিতে পাইতেন তবে খুশী হইতেন। তখন তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল, মানুষের কাছে কোন কিছু না থাকিলে চিন্তাযুক্ত হয়, আর থাকিলে খুশী হয় আর আপনাকে উহার বিপরীত দেখা যাইতেছে কারণ কি? তিনি উত্তরে বলিলেন, সকালে যখন আমার ঘরে কিছু না থাকে তখন আমি এইজন্য খুশী হই যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর অনুসরণ আমার ভাগ্যে জুটিয়াছে আর যখন কিছু থাকে তখন চিন্তা যুক্ত হই এইজন্য যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর পরিবারবর্গের অনুসরণ আমার ভাগ্যে জুটে নাই। আমরা আরো জানিতে পারিয়াছি যে, তাহারা যখন সুখ স্বাচ্ছন্দ্য আসিতে দেখিতেন তখন চিন্তিত হইয়া পড়িতেন এবং বলিতেন দুনিয়া দিয়া আমরা কি করিব। জানিনা আল্লাহর কি ইচ্ছা। আর যখন মুসীবত দেখিতেন তখন বলিতেন, এখন আল্লাহ তায়ালা আমাদের খবর গিরি করিতেছেন। এই ছিল সলফদের অবস্থা। রবং আমি যাহা বর্ণনা করিয়াছি তাহারা ইহার চাইতে আরো বেশী গুনের অধিকারী ছিলেন। এখন বল তুমি কি এমন? কখনও নহে।

হে দুনিয়াদার। আমি তোমার এমন কিছু অবস্থা বলিব যেইগুলি তাহাদের অবস্থার সম্পূর্ণ বিপরীত। সেইটি হইল, তুমি ধনবত্তার অবস্থায় নাফরমানী শুরু কর, সুখস্বাচ্ছন্দ্যের অবস্থায় গর্ব ও বড়াই করিতে শুরু কর, নেয়ামত দানকারীর শোকর ও কৃতজ্ঞতা হইতে গাফেল হইয়া যাও, দুঃখ কষ্টের সময় নিরাশ হইয়া যাও, বিপদের সময় অসন্তুষ্ট হইয়া যাও, কাযা ও কদরের প্রতি সন্তুষ্ট থাক না, দারিদ্রকে অপছন্দ কর অথচ ইহা নবী ও রাসূলগনের গর্বের বিষয় আর তুমি তাঁহাদের গর্বের বিষয়কে অপছন্দ করিতেছ। তুমি দারিদ্রের ভয়ে মাল সঞ্চয় করিতেছ অথচ ইহা আল্লাহর প্রতি কু-ধারনার শামিল। এবং তাঁহার যিম্মাদারির প্রতি দুর্বল বিশ্বাসের নামান্তর। আর গোনাহর জন্য ইহাই যথেষ্ট। তুমি মাল সঞ্চয় করিতেছ দুনিয়ার সুখ উপভোগ করার জন্য, দুনিয়ার শাহাওয়াত পূর্ণ করার নিমিত্ত অথচ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলিয়াছেন, আমার উম্মতের মধ্যে নিকৃষ্ট লোক তাহারা, যাহারা ভোগ-বিলাসের মধ্যদিয়া লালিত পালিত হইয়াছে এবং তাহাদের দেহ বড় হইয়াছে। কোন আলেম বলিয়াছেন, কেয়ামতের দিন কিছু লোক আসিয়া নিজেদের নেকআমল তালাশ করিবে। তখন তাহাদিগকে বলা হইবে, তোমরা আপন উত্তম ভোগসামগ্রী পার্থিব জীবনে ভোগ করিয়া ফেলিয়াছ এবং শেষ করিয়া দিয়াছ। তুমিতো দুনিয়ার নেয়ামতের কারণে আখেরাতের নেয়ামত হারাইয়া ফেলিয়াছ। অথচ তুমি টেরও পাইতেছ না। ইহার চাইতে বড় মুসীবত এবং আফসোস আর কি হইতে পারে? তুমি হয় তো মাল সঞ্চয় করিতেছ, দুনিয়ার চাকচিক্য গর্ব ও বড়াইয়ের নিমিত্ত অথচ আমরা জানিতে পারিয়াছি, যে ব্যক্তি গর্ব ও বড়াইয়ের উদ্দেশ্যে মাল সঞ্চয় করে সে

আল্লাহর সহিত সাক্ষাৎ করিবে এমতাবস্থায় যে, আল্লাহ তায়ালা তাহার প্রতি রাগান্বিত থাকিবেন। গর্ব ও বড়াইয়ের উদ্দেশ্যে মাল সঞ্চয় করার কারণে তোমার প্রতি আল্লাহর যে গযব ও ক্রোধ পতিত হইতেছে, তাহাতে তোমার যেন কোন পরোয়া নাই। মনে হয় যেন দুনিয়াতে থাকাটা তোমার কাছে আপন রবের নিকট যাওয়ার তুলনায় অধিক প্রিয়। তুমি যেহেতু আল্লাহর সাক্ষাৎ অপছন্দ করিতেছ তাই আল্লাহ তোমার সাক্ষাৎকে আরো বেশী বেশী অপছন্দ করিবেন। অথচ তুমি তাহা উপলব্ধি করিতে পারিতেছ না। তুমি হয়ত পার্থিব কোন বস্তু হারাইয়া যাওয়ার দরুন চিন্তিত হও এবং আফসোস কর অথচ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি দুনিয়াবী বস্তু হারানোর কারণে আফসোস করে, সে এক মাসের পথ জাহান্নামের নিকটবর্তী হইয়া যায়। কোন বর্ণনা মতে এক বৎসরের পথ নিকটবর্তী হইয়া যায়। আর তুমি নির্দিধায় জাহান্নামের নিকটবর্তী হইতে যাইতেছ। সম্ভবতঃ তুমি দুনিয়া লাভের জন্য দ্বীন হইতে বাহির হইয়া যাইতেছ এবং দুনিয়া আগমনে আনন্দিত হইতেছ। অথচ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি দুনিয়াকে ভালবাসে এবং উহার কারণে খুশী হয় তাহার অন্তর হইতে আখেরাতের ভয় দূরীভূত হইয়া যায়। কোন আলেম বলিয়াছেন, দুনিয়া হারানোর কারণে খুশী হইলে এবং উহা লাভ হওয়াতে আফসোস করিলে হিসাব লওয়া হইবে। তুমি তো দুনিয়ার কারণে খুশী অথচ অন্তর হইতে আল্লাহর ভয়কে বাহির করিয়া দিয়াছ। তুমি আখেরাতের তুলনায় দুনিয়ার বিষয় সমূহের প্রতি বেশী গুরুত্ব দিয়া থাক। দ্বীনের ক্ষতি তোমার কাছে দুনিয়ার ক্ষতির তুলনায় সহজ। দুনিয়ার হারাইয়া যাওয়ার ভয় তোমার অন্তরে গোনাহর ভয়ের চাইতে বেশী। তুমি মানুষের ময়লা উপার্জন করিয়া সেইগুলি ব্যয় করিতেছ, একমাত্র পার্থিব মান-মর্যাদা লাভের উদ্দেশ্যে। তুমি আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করিয়া মানুষকে সন্তুষ্ট করিতেছ যাহাতে সম্মানিত হও। তোমার কাছে যেন কেয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালা যে তোমাকে অপমানিত করিবেন, উহা দুনিয়াতে মানুষ যে অপমানিত করিবে তাহার তুলনায় সহজ ও হালকা মনে হইতেছে। তুমি মানুষের কাছে আপন দোষ-ক্রুটি গোপন করিতেছ অথচ আল্লাহ তায়ালা যে এই সম্বন্ধে অবগত আছেন উহার কোন পরোয়া করিতেছ না। মনে হয় যেন আল্লাহর কাছে অপমানিত হওয়া তোমার কাছে মানুষের কাছে অপমানিত হওয়ার তুলনায় সহজ। মনে হয় যেন, তোমার অজ্ঞতার কারণে তোমার কাছে আল্লাহর চাইতে বান্দার মূল্য বেশী। তোমার মধ্যে এই সমস্ত আবর্জনা ও ময়লা থাকা অবস্থায় জ্ঞানীদের সম্মুখে কিরূপে কথা বল ? ধিক্ তোমার জীবন। তুমি কিরূপে নেককারদের মাল দ্বারা প্রমাণ পেশ কর? তুমিতো পুন্যবান সলফদের স্থান হইতে বহু দূরে। আমরা জানিতে পরিয়াছি, তাঁহারা হালাল বস্তুর ব্যাপারেও এতটুকু অনীহ ছিলেনা যে, তোমার হারামের ব্যাপারে ততটুকু অনীহা নও। তোমাদের কাছে যে জিনিষে কোন রূপ অসুবিধা নাই ঐ জিনিষ তাঁহাদের কাছে ধ্বংসাত্মক বলিয়া বিবেচিত হইত। তোমরা কবীরা গোনাহকে যতটুকু মারাত্মক ও জঘন্য

মনে কর, তাঁহাদের কাছে সাধারণ পদস্খলনও উহার চাইতে জঘন্য মনে হইত। তোমাদের হালাল মালও যদি তাঁহাদের সন্দেহ যুক্ত মালের ন্যায় হইত। তাঁহারা নেক কাজ কবুল হয় কিনা এই আশংকায় যেইরূপ ভয় করিয়াছেন, তুমি যদি গোনাহর ব্যাপারে তদ্রূপ ভয় করিতে। তোমার রোযা যদি তাঁহাদের ইফতার অর্থাৎ রোযাবিহীন অবস্থার ন্যায় হইত। তোমার সমস্ত নেক কাজ যদি তাঁহাদের একটি ছোট অপরাধের ন্যায় হইত। জনৈক সাহাবী বলিয়াছেন, দুনিয়া সিদ্দীকীন হইতে যত সরাইয়া রাখা হয়, উহাকে ততবেশী গনীমত মনে করা হয়। যে ব্যক্তি এমন হইবে না, সে দুনিয়া আখেরাত কোথাও তাঁহাদের সহিত থাকিবে না; সুবহানাল্লাহ। দুই শ্রেনীর মধ্যে কত পার্থক্য। সাহাবীদের দল আল্লাহর কাছে উন্নত মর্যাদার অধিকারী হইবে, তোমাদের মত লোক নিম্নস্তরে থাকিবে অথবা আল্লাহ তায়ালা আপন অনুগ্রহে মাফ করিয়া দিবেন।

তুমি যদি এই কথা বল যে, আমি মাল সঞ্চয় করিতেছি অপ্রত্যাশী থাকার নিমিত্ত এবং আল্লাহর পথে খরচ করার উদ্দেশ্যে, তবে তুমি চিন্তা করিয়া দেখ তাঁহারা স্বীয় যুগে যেমন হালাল মাল পাইতেন, তুমি স্বীয় যুগে অনুরূপ হালাল মাল পাইতেছ কি না। তুমি কি এই কথা মনে কর যে, তাঁহারা হালাল মাল অন্বেষনের ক্ষেত্রে যেমন সতর্কতা অবলম্বন করিতেন, তুমি অনুরূপ সতর্কতা অবলম্বন কর? আমি জানিতে পারিয়াছি কোন এক সাহাবী বলিয়াছেন, আমরা একটি হারামে যেন পতিত না হইয়া যাই, সেই জন্য সত্তরটি হালাল বর্জন করিয়া দিতাম। তুমি নিজের ব্যাপারে এমন সতর্কতার আশা করিতে পার কি ? কখনও নহে। তুমি বিশ্বাস কর যে, নেক কাজের উদ্দেশ্যে যে মাল সঞ্চয় করিতেছ তাহা নিছক শয়তানের প্রতারনা, যাহাতে শয়তান তোমাকে ইহার মাধ্যমে হারাম মিশ্রিত সন্দেহযুক্ত মাল উপার্জনে লিপ্ত করিতে পারে। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি সন্দেহযুক্ত মাল উপার্জনে সাহস করে অচিরেই হারামে পতিত হইয়া যাইবে। হে দাম্ভিক তুমি কি জান না যে, আল্লাহর কাছে তোমার যে মর্যাদা রহিয়াছে, সেই হিসাবে সন্দেহযুক্ত মাল উপার্জন করতঃ উহা আল্লাহর পথে ব্যয় করার চাইতে, উহাতে লিপ্ত হওয়ার ভয় উত্তম ও উন্নত ছিল। জনৈক আলেম বলিয়াছেন, হালাল না হওয়ার আশংকায় একটি দেরহাম বর্জন করা সন্দেহযুক্ত হাজার দীনার সদকা করার চাইতে উত্তম, তুমি যদি বল যে, তুমি অতি পরহেযগার ও সতর্ক। অতএব তুমি সন্দেহযুক্ত মাল উপার্জনে লিপ্ত হইবে না বরং হালাল মাল উপার্জন করিবে এবং আল্লাহর পথে খরচ করিবে যাহাতে কমপক্ষে হিসাব নিকাশের সম্মুখীন না হও। কেননা বিশিষ্ট সাহাবায়ে কেরাম ও হিসাব নিকাশ কে ভয় করিয়াছেন।

বর্ণিত আছে, জনৈক সাহাবী বলেন, আমি যদি প্রতি দিন এক হাজার হালাল দীনার উপার্জন করি আর উহা আল্লাহর পথে ব্যয় করি আর এই কাজের দরুন আমার জুমআর নামাযও বিঘ্নিত না হয়, তবু ইহা আমার কাছে পছন্দনীয় নহে। জিজ্ঞাসা করা হইল কেন? উত্তরে বলিলেন, এমতাবস্থায় আমি হিসাবে মুক্ত থাকিব। কেয়ামতের দিন ধনী লোকদিগকে জিজ্ঞাসা করা হইবে, তুমি মাল

কোথায় হইতে অর্জন করিয়াছ এবং কোথায় খরচ করিয়াছ ? এই সমস্ত মুত্তাকী লোক ইসলামের প্রথম যুগে ছিলেন, ঐ সময় হালাল ও বিদ্যমান ছিল , তথাপি তাহারা মাল বর্জন করিয়াছেন হিসাবের ভয়ে এবং এই আশংকায় যে, না জানি নেকী, বদী না নিয়া আসে। তুমি এখন নিশ্চিত এবং তোমার কাছে হালাল মালও নাই। তুমি ময়লা ও অপবিত্র জিনিষ সঞ্চয় করিতেছ আবার দাবী করিতেছ যে, হালাল মাল সঞ্চয় করিতেছি। হালাল আছে কোথায় যে তুমি সঞ্চয় করিবে। যদি হালাল মাল থাকেই তবে তুমি কি আশংকা কর না যে, ধনস্পদের কারণে অন্তরের অবস্থা খারাপ হইয়া যাইবে ? কোন কোন সাহাবী মীরাছ পাইয়া ও গ্রহণ করিতেন না এই আশংকায় যে, অন্তরের অবস্থা খারাপ হইয়া যাইবে। তুমি কি এই আশা কর যে, তোমার অন্তর সাহাবায়ে কেরামের অন্তর হইতে বেশী মুত্তাকী ও পরহেযগার। অতএব কোন কারণে হক হইতে বিচ্যুত হইবে না? যদি তুমি এই ধারনা পোষণ করিয়া থাক, তবে তুমি নফসে আম্মারার প্রতি সুধারনা পোষণ করিতেছ। আমি তোমার হিতাকাঙ্খী হিসাবে বলিতেছি তুমি প্রয়োজন পরিমাণ মালে তুষ্ট থাক। নেককাজের উদ্দেশ্যে অতিরিক্ত মাল সঞ্চয় করত; হিসাব নিকাশের সম্মুখীন হইও না। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তির হিসাব লওয়া হইবে সে আযাবে পতিত হইবে। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলিয়াছেন, কেয়ামতের দিন এমন এক ব্যক্তিকে হাজির করা হইবে, যে হারাম মাল উপার্জন করিয়াছে এবং উহা হারাম পথে ব্যয় করিয়াছে। তাহার সম্বন্ধে নির্দেশ দেওয়া হইবে, তাহাকে জাহান্নামে লইয়া যাও। আরেক ব্যক্তিকে হাজির করা হইবে, যে হালাল মাল উপার্জন করিয়াছে, কিন্তু উহা হারাম পথে ব্যয় করিয়াছে। তাহার সম্বন্ধে নির্দেশ হইবে তাহাকে জাহান্নামে লইয়া যাও। আরেক ব্যক্তিকে হাজির করা হইবে, যে হারাম মাল উপার্জন করিয়াছে আর হালাল পথে ব্যয় করিয়াছে। তাহার সম্বন্ধে নির্দেশ হইবে তাহাকে জাহান্নামে লইয়া যাও। আরেক ব্যক্তিকে হাজির করা হইবে, যে হালাল মাল উপার্জন করিয়াছে এবং হালাল পথে ব্যয় করিয়াছে। তাহার সম্বন্ধে নির্দেশ হইবে তুমি থাম, হয়ত তুমি এই মাল উপার্জন করিতে গিয়া ফরয নামাযে ত্রুটি করিয়াছ, যথা সময়ে আদায় কর নাই, রুকু সেজদা কিংবা অযুতে ত্রুটি করিয়াছ। সে বলিবে, হে রব। আমি হালাল মাল উপার্জন করিয়াছি এবং হালাল পথে খরচ করিয়াছি, আর ইহার দরুন কোন ফরয ইবাদতে ত্রুটি করি নাই। বলা হইবে হয়ত তুমি কোন সাওয়ারী বা পোশাক লইয়া গর্ব করিয়াছ। সে বলিবে হে রব। আমি কোন জিনিষ লইয়া গর্ব করি নাই। বলা হইবে, তুমি হয়ত আমি যাহাদিগকে দান করার নির্দেশ দিয়াছিলাম যেমন আত্মীয় স্বজন, ইয়াতীম ও মিসকীন তাহাদিগকে দান কর নাই। সে বলিবে, হে রব। আমি এই মাল হালাল পন্থায় উপার্জন করিয়াছি হালাল পথে ব্যয় করিয়াছি। এই মালের দরুন কোন ফরয ইবাদতে ত্রুটি করি নাই, কোন প্রকার গর্ব করি নাই বা কাহারো কোন হক বিনষ্ট করি নাই। অতঃপর উহারা সবাই আসিয়া উপস্থিত হইবে এবং বলিবে, হে রব। আপনি তাহাকে মাল দান করিয়াছেন ধনী বানাইয়াছেন এবং

আমাদিগকে দান করার নির্দেশ দিয়াছেন। যদি সে তাহাদিগকে দান করিয়া থাকে, কোন প্রকার গর্ব না করিয়া থাকে এবং কোন ফরয বিনষ্ট না করিয়া থাকে তবে বলা হইবে, থাম এবং এখন এই সমস্ত নেয়ামত যথা খাদ্যপানীয় ইত্যাদির শোকরিয়া পেশ কর। অতঃপর তাহাকে বিভিন্ন নেয়ামত সম্পর্কে প্রশ্ন করিতে থাকিবে। এখন বলুন কে ঐ ব্যক্তি যে এমন কঠিন হিসাবের সম্মুখীন হইবে, যে হিসাব এমন ব্যক্তির হইবে যাহার সবকিছু হালাল ছিল, যে সমস্ত ফরয যথাযথ ভাবে আদায় করিয়াছে, সমস্ত হক আদায় করিয়াছে তারপরও তাহাকে এমন হিসাবের সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। এখন আমাদের মত লোকের কি অবস্থা হইবে যাহারা দুনিয়ার ফেতনা, শুবাহ সন্দেহ, শাহওয়াত এবং চাকচিক্যে নিমজ্জিত? হে হতভাগা! এই সমস্ত প্রশ্ন ও হিসাবের ভয়ে মুত্তাকী লোকেরা জীবন ধারনযোগ্য মাল ধারনে যথেষ্ট বোধ করিয়াছেন এবং মাল সম্পর্কিত বিভিন্ন নেক আমল করিয়াছেন। এই সমস্ত উত্তম লোকের মধ্যে তোমার জন্য নমুনা রহিয়াছে। আর তুমি এই ধারনা কর যে, তুমি অতি মুত্তাকী ও পরহেযগার, হালাল মাল উপার্জন করিতেছ অপ্রত্যাশী থাকার জন্য এবং আল্লাহর পথে খরচ করার উদ্দেশ্যে, যে হালাল মাল খরচ করিবে, তাহা হক ও সঠিক পথে খরচ করিবে, মালের কারণে তোমার অন্তরে কোনরূপ পরিবর্তন আসিবে না, প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য কোন ব্যাপারেই আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করিবে না। আর বাস্তবেই যদি তুমি এইরূপ হইয়া থাক আসলে তুমি এইরূপ নও। তবে তোমার উচিৎ প্রয়োজন পরিমাণ মালে যথেষ্টবোধ করা। এবং যে সমস্ত মালদার হিসাবের জন্য দাঁড়াইয়া থাকিবে তাহাদের নিকট হইতে পৃথক হইয়া রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাফেলায় প্রথমেই অন্তর্ভুক্ত হইয়া যাওয়া। হিসাবের জন্য যেন আটকাইয়া থাকিতে না হয়। কেননা তখন হয়ত মুক্তি লাভ হইবে অথবা ধ্বংস হইতে হইবে। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলিয়াছেন, দরিদ্র মুহাজিররা ধনীদের পাঁচশত বৎসর আগে জান্নাতে যাইবে। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) অপর হাদীসে বলিয়াছেন, দরিদ্র মুমেনরা ধনীদের আগে জান্নাতে যাইয়া পানাহার করিবে এবং সুখ উপভোগ করিবে আর ধনীরা নতজানু হইয়া বসিয়া থাকিবে। আল্লাহ তায়ালা তাহাদিগকে বলিবেন, তোমাদের কাছে আমার কিছু দাবী আছে। তোমরা বাদশাহ ও শাসক ছিলে। বলতো আমি তোমাদিগকে যে সম্পদ দান করিয়াছিলাম উহাতে কি কাজ করিয়াছ?

কোন আলেম বলিয়াছেন, আমি যদি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সহিত প্রথম কাফেলায় অন্তর্ভূক্ত না হইতে পারি, তবে লাল উষ্ট্রও যদি আমার লাভ হয় তবু আমি খুশী হইব না। অতএব বন্ধুগণ। আপনারা হালকা পাতলা অবস্থায় রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর দলভুক্ত হওয়ার চেষ্টা করুন। বর্ণিত আছে, একদা হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাদিঃ) পানি চাইলেন। তাঁহার কাছে পানি ও মধু উপস্থিত করা হইল। যখন উহা পান করিলেন ক্রন্দনের কারণে শ্বাস বন্ধ হইয়া আসিতে ছিল। তাঁহার ক্রন্দনে অন্যেরাও কাঁদিল। অশ্রু মুছিয়া কথা বলিতে চাহিলেন কিন্তু আবার ক্রন্দন

আসিয়া গেল। যখন খুব কাঁদিতে ছিলেন তখন লোকজন জিজ্ঞাসা করিল, এই সবক্রন্দন কি এই পানের দরুন ? উত্তরে বলিলেন, হ্যাঁ, একদিন আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সহিত আমার ঘরে ছিলাম। আমাদের সহিত তৃতীয় আর কেহ ছিল না। হঠাৎ দেখিতে পাইলাম তিনি যেন কাহাকেও সরাইতেছেন। বলিতেছেন, আমার নিকট হইতে সর। আমি বলিলাম, হে আল্লাহর রাসূল। আপনার জন্য আমার পিতামাতা উৎসর্গ হউন, আপনার সম্মুখেতো কাহাকেও দেখিতেছিনা আপনি কাহার সঙ্গে কথা বলিতেছেন ? উত্তরে বলিলেন, দুনিয়া আমার কাছে মাথা ও গর্দান উঁচু করিয়া আসিয়াছে এবং আমাকে বলিতেছে, হে মুহাম্মদ! আমাকে গ্রহন করুন। আমি বলিলাম, আমার নিকট হইতে সর, তখন সে বলিল, হে মুহাম্মদ! আপনি যদিও আমার হাত হইতে রক্ষা পান কিন্তু আপনার পরবর্তীরা রক্ষা পাইবে না। তাই আমি ভয় পাইতেছি, না জানি দুনিয়া আমাকে ধরিয়া ফেলিয়াছে, আর সে আমাকে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিবে।

বন্ধুগণ! ইহারা আশংকাবোধ করিয়াছেন, নাজানি এই পানীয়টুকু রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেয় এবং তজ্জন্য ক্রন্দন করিয়াছেন। অথচ উহা হালাল ছিল, কমবখ্‌ত! তুমি নানা রকম হারাম, সন্দেহ যুক্ত খানা পিনা, শাহওয়াত ও ভোগ বিলাসে মত্ত থাকিয়াও বিচ্ছিন্নতার ভয় করিতেছ না? ধিক তোমার জীবন। তুমিতো চরম মূর্খ। কমবখ্‌ত, তুমি যদি কেয়ামতের দিন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়। তবে এমন বিভীষিকার সম্মুখীন হইবে যাহার কারণে ফেরেশতাগণ এবং পয়গম্বরগণ! ভীত থাকিবেন, যদি তুমি এখনও ক্রটি কর তবে তাহাদের সহিত মিলিতে পারিবে না। আর যদি ধনের প্রাচুর্য কাম্য হয় তবে কঠিন হিসাবের জন্য ধৈর্যধারণ করিতে হইবে। যদি অল্পে তুষ্ট না হও তবে দীর্ঘক্ষণ হাশরের মাঠে দাঁড়াইয়া থাকিতে হইবে এবং আহাজারি ও হায় হায় করিতে হইবে। যদি তুমি পশ্চাদপসরণ কারীদের আস্থার প্রতি সন্তুষ্ট থাক, তবে আসহাবে ইয়ামীন অর্থাৎ জান্নাতবাসী এবং রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িবে এবং জান্নাতের নেয়ামত বিলম্বিত হইবে। আর যদি মুত্তাকীদের অবস্থার বিরোধিতা কর, তবে কেয়ামতের দিনের বিভীষিকায় আটকা পড়িয়া থাকিবে। অতএব যাহা কিছু শুনিলে উহাতে চিন্তা কর। তুমি যদি মনে কর যে, আমি সলফদের ন্যায় অল্পেতুষ্ট, হালাল অন্বেষণকারী, মাল আল্লাহর পথে উৎসর্গকারী, নিজের উপর অপরকে অগ্রাধিকার দানকারী, দারিদ্রকে ভয় করিনা। আগামী দিনের জন্য সঞ্চয় করি না, ধনবত্তাকে অপছন্দ করি, দারিদ্র ও মুছীবতকে পছন্দ করি, স্বল্পতা ও দারিদ্রতায় আনন্দিত , তুচ্ছতায় খুশী, মর্যাদা ও খ্যাতি অপছন্দ করি, নিজের ব্যাপারে কঠোর ও শক্তিশালী, আমার অন্তর হেদায়েত ও সরল পথ হইতে বিচ্যুত হইবে না। আল্লাহর জন্য স্বীয় নফসকে আবদ্ধ রাখি। আল্লাহর সন্তুষ্টি ও মর্জি অনুযায়ী সমস্ত কাজ করি। হিসাবের সম্মুখীন হইতে হইবে না, আর আমার মত মুত্তাকী হিসাবের সম্মুখীন হইতে পারে না। আমি

তো মাল সঞ্চয় করি আল্লাহর পথে খরচ করার উদ্দেশ্যে, তবে হে দাম্ভিক ও প্রতারিত। তুমি নিজের বিষয়টি গভীরভাবে চিন্তা করিয়া দেখ তুমি জাননা যে, মাল সঞ্চয়ের ঝামেলা ও ব্যস্ততা হইতে মুক্ত থাকা এবং অন্তরকে আল্লাহর যিকির, চিন্তা ও ধ্যানে মশগুল করা দ্বীনের জন্য অতি নিরাপদ, হিসাব নিকাশ সহজ হওয়ার জন্য অত্যন্ত উপযোগী; কেয়ামতের বিভীষিকা মুক্ত হওয়ার জন্য অতি মুনাসিব পন্থা এবং অধিক ছাওয়াব লাভের এবং আল্লাহর কাছে মর্যাদা বৃদ্ধির কারণ? জনৈক সাহাবী বলিয়াছেন, কাহারো কাছে যদি অনেক দীনার থাকে আর সেগুলি দান করে। আরেক ব্যক্তি আল্লাহর যিকিরে মশগুল থাকে তবে এই যিকিররত ব্যক্তিই উত্তম বলে গণ্য হইবে। কোন আলেমকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল যে, এক ব্যক্তি নেক কাজের উদ্দেশ্যে মাল সঞ্চয় করে। সে কেমন? উত্তরে বলিলেন, সঞ্চয় না করাই উত্তম কাজ। জনৈক তাবেয়ীর নিকট জিজ্ঞাসা করা হইল, এক ব্যক্তি মাল তালাশ করিয়া পাইয়াছে, অতঃপর উহা আত্মীয়-স্বজনের জন্য এবং আল্লাহর পথে খরচ করিয়াছে, আরেক ব্যক্তি মাল তালাশও করে নাই লাভও করে নাই। এ দুজনের মধ্যে কে উত্তম? তিনি উত্তরে বলিলেন, এই দুজনের মধ্যে পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্তের ব্যবধান। দ্বিতীয় ব্যক্তিই উত্তম। তুমি দুনিয়াদারের তুলনায় যে মর্যাদা লাভ করিবে তাহা দুনিয়া বর্জ্জনের মাধ্যমেই, তুমি যদি দুনিয়াতে মালের চিন্তা বাদ দাও তবে ইহাতে তোমার শরীর ভাল থাকিবে, কষ্ট কম হইবে, জীবন সুখী হইবে, মন খুশী থকিবে এবং চিন্তা হ্রাস পাইবে। অতএব মাল সঞ্চয় বাদ দিতে তোমার অসুবিধা কোথায়? অথচ নেক কাজে খরচ করার উদ্দেশ্যে মাল উপার্জন করার তুলনায় মাল বর্জন করাই উত্তম। ইহাতে দুনিয়াতেও শান্তি লাভ হইবে পরকালেও মর্যাদা লাভ হইবে।

যদি ধরিয়া লওয়া হয় যে, মাল সঞ্চয়ে বিরাট মর্যাদা রহিয়াছে তবে উদার চরিত্রের বেলায় রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর অনুসরণ করা উচিৎ। যেহেতু আল্লাহ তায়ালা তাঁহার ওছীলায় তোমাকে হেদায়াত দান করিয়াছেন-, এবং তিনি যে দুনিয়া বর্জন অবলম্বন করিয়াছেন তাহা পছন্দ করা উচিৎ। আমি যাহা কিছু বলিয়াছি উহাতে ধ্যান কর এবং দৃঢ় বিশ্বাস রাখ যে, কামিয়াবী এবং সফলতা দুনিয়া বর্জনের মধ্যে নিহিত। অতএব আগে জান্নাতে যাওয়ার জন্য রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর পতাকার সাথে সাথে চল। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলিয়াছেন, জান্নাতে মুমেনদের সরদার হইবে এমন ব্যাক্তি যে দুনিয়াতে সকালের খানা খাইলে বিকালের খানা পায় না, কাহারো কাছে ধার চাহিলে ধার পায় না, সতর ঢাকিবার বস্ত্র ছাড়া তাহার অতিরিক্ত কোন বস্ত্র নাই, প্রয়োজন মিটাইবে সেই পরিমান মাল উপার্জনে সক্ষম নহে। সকাল বিকাল ইহাতেই আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট থাকে।

فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا -

অর্থ– তাহারা ঐ সমস্ত লোকের সহিত থাকিবে যাহাদের প্রতি আল্লাহ তায়ালা অনুগ্রহ করিয়াছেন অর্থাৎ নবীগণ, সিদ্দীকগণ ও শহীদগণ আর ঐ সমস্ত লোক উত্তম সঙ্গী।

হে ভাই! তুমি আমার এই দীর্ঘ উপদেশের পরও আর কত দিন মাল সঞ্চয়ে লিপ্ত থাকিবে। তুমি যে দাবী করিতেছ যে, নেক কাজের উদ্দেশ্যে এবং ছাওয়াব লাভের উদ্দেশ্যে মাল সঞ্চয় করিতেছ, এই দাবীতে তুমি মিথ্যাবাদী এবং তুমি দারিদ্রের ভয়ে মালসঞ্চয় করিতেছ। সুখ স্বাচ্ছন্দ্য, চাকচিক্যতা, বিলাসিতা, গর্ব, বড়াই, রিয়া, সম্মান, খ্যাতি ইত্যাদির উদ্দেশ্যে মাল সঞ্চয় করিতেছ। তারপর দাবী করিতেছ যে, আমি নেক কাজের উদ্দেশ্যে মাল সঞ্চায় করিতেছি। তুমি ধ্যান কর এবং স্বীয় দাবীর জন্য লজ্জিত হও। তুমি যদি মাল ও দুনিয়ার ভাল-বাসায় আক্রান্ত হইয়া থাক তবে এই কথা স্বীকার কর যে, মর্যাদা এবং কল্যান হইল প্রয়োজন পরিমান মাল অর্জনে, অতিরিক্ত মাল বর্জনের প্রতি সন্তুষ্ট থাকার মধ্যে। আর যখন মাল সঞ্চায় কর তখন নিজেকে তুচ্ছ মনে কর, স্বীয় অন্যায় স্বীকার এবং হিসাবকে ভয় কর। ইহাই মালসঞ্চয়ের প্রমান তালাশ করার চাইতে নাজাত লাভের এবং মর্যাদা লাভের অধিকতর উপযোগী।

বন্ধুগণ! সাহাবায়ে কেরামের যুগে হালাল মাল বিদ্যমান ছিল। এতদসত্বে ও তাঁহারা মাল সঞ্চয় হইতে দূরে সরিয়া রহিয়াছেন। আর আমরা এমন এক যুগে আছি যে, এই যুগে হালাল দুর্লভ। সুতরাং হালাল দ্বারা অন্নবস্ত্রের ব্যবস্থা হইবে কিরূপে ? আর এই যুগে মাল সঞ্চয়ের কোন প্রশ্নই উঠে না। অতএব আল্লাহ তায়ালা আমাদিগকে ইহা হইতে পানাহ দিন। আমাদের মধ্যে সাহাবায়ে কেরামের তাকওয়া, পরহেযগারী, যুহদ, সতর্কতা কোথায়, তাহাদের ইখলাস ও নির্মল অন্তর আমাদের মধ্যে কোথায়? আল্লাহর কসম আমাদের অন্তর নফসানী ব্যাধিসমূহে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে। অচিরেই কেয়ামতের দিন বিচারের সম্মুখীন হইতে হইবে। ঐ দিন অতি সৌভাগ্যবান ঐ ব্যক্তিরাই হইবে, যাহারা হালকা থাকে আর মালদার ব্যাক্তিরা অত্যন্ত দুঃখ ও চিন্তার সম্মুখীন হইবে। আমি আপনাদিগকে হিতাকাঙ্খী হিসাবে উপদেশ শুনাইয়া দিলাম এখন গ্রহন করা আপনাদের কাজ। আর গ্রহণকারীর সংখ্যা খুবই কম। আল্লাহ তায়ালা আপন অনুগ্রহে আমাদিগকে এবং আপনাদিগকে সর্ব প্রকার নেক কাজের তৌফীক দান করুন, আমীন।

হারেছ মুহাসিবী (রহঃ)-এর ধনব ত্তার উপর দারিদ্রের প্রাধান্য সম্পর্কিত আ-লোচনা এখানে শেষ হইল। এতটুকু আলোচনাই যথেষ্ট। দুনিয়ার নিন্দা অধ্যায়ে এবং দারিদ্র ও যুহদ অধ্যায়ে, আমি যাহা কিছু বর্ণনা করিয়াছি উহাও ইহার সাক্ষী ও প্রমান। এতদসম্পর্কিত আরো কতিপয় ঘটনা উল্লেখযোগ্য। যথাঃ–

আবু উমামা বাহেলী (রাদিঃ) বর্ণনা করেন, একদা ছা'লাবা ইবনে হাতেব রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর খেদমতে আসিয়া বলিল ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি আল্লাহর কাছে দোয়া করুন যেন আমাকে মাল দান করেন।

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলিলেন, হে ছা'লাবা! সামান্য মালে যাহার শোকরিয়া আদায় করিতে পারিবে, অধিক মালের তুলনায় উত্তম যাহার শোকরিয়া আদায় করিতে সক্ষম হইবে না। ছালাবা আবার বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম), দোয়া করুন আল্লাহ তায়ালা আ-মাকে মাল দান করুন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলিলেন, হে ছালাবা! তুমি কি আমার অনুকরণ করিবে না? তুমি কি ইহা পছন্দ কর না যে আল্লাহর নবীর মত হও? আল্লাহর কসম, আমি যদি চাই যে সোনা রূপার পাহাড় আমার সাথে সাথে চলুক তবে তাহাই হইবে। ছালাবা বলিল, ঐ সত্তার কসম যিনি আপনাকে সত্য দ্বীন দিয়া পাঠাইয়াছেন আপনি যদি আল্লাহর কাছে মালের জন্য দোয়া করেন, তবে প্রত্যেক হকদারকে তাহার হক প্রদান করিব আরো বহু কাজ করিব। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দোয়া করিলেন, হে আল্লাহ! ছাঁলাবাকে মাল দান করুন, ইহার পর ছাঁলাবার হাতে কিছু ছাগল আ-সল, ঐ ছাগলগুলি কীট ও পোকার ন্যায় বৃদ্ধি পাইতে শুরু করিল। ঐগুলি লইয়া মদীনায় থাকা আর তাহার জন্য সম্ভব হইল না, সে কোন এক মাঠে চলিয়া গেল। দূরে চলিয়া যাওয়ার কারনে এবং ব্যস্ততার দরুন এখন সে কেবল যোহর এবং আসরের নামায জামাতে আদায় করে অন্য নামায আর জামাতে আদায় করে না। ইহার পর যখন ছাগল আরো বৃদ্ধি পাইল তখন কেবল জুমআর নামাযটি জামাতে আসিয়া আদায় করে আর বাকী সমস্ত নামাযের জামাত বর্জন করিয়া দেয়। কিছুদিন পর যখন ছাগল আরো বৃদ্ধি পাইল তখন সে জুমআও ছাড়িয়া দিল। জুমআর দিন বিভিন্ন কাফেলার সহিত সাক্ষাৎ হইলে সে তাহাদের নিকট মদীনার হাল অবস্থা জিজ্ঞাসা করিত। একবার রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আল-াইহি ওয়াসাল্লাম) তাহার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে তাহার সমস্ত বৃত্তান্ত শুনানো হইল। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইহা শুনিয়া খুব আফসোস করিলেন। ঐ সময় নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হয়-

خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ اِنَّ صَلٰوتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ-

আপনি তাহাদের মালের সদকা (যাকাত) গ্রহণ করুন যাদ্বারা তাহাদিগকে পবিত্র ও নির্মল করিবেন আর তাহাদের জন্য দুয়া করুন, নিশ্চয় আপনার দুয়া তাহাদের জন্য শান্তির কারণ।

অর্থাৎ, আল্লাহ তায়ালা যাকাত ফরয করিলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দুইজন ব্যক্তিকে যাকাত উসুল করার জন্য পাঠাইলেন। একজন জুহাইনা গোত্রের অপর জন বনি সুলাইম গোত্রের। তাহ-াদের হাতে একটি চিঠি ও পরিচয় পত্র লিখিয়া দিলেন এবং বলিলেন, তোমরা ছালাবা ইবনে হাতেব ও বনি সুলাইম-এর অমুক ব্যাক্তির নিকট হইতে যাকাত উসুল করিয়া নিয়া আস। তাহারা উভয়ই বাহির হইল এবং প্রথমে ছালাবার

নিকট গেল, ছালাবাকে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর চিঠি দেখাইল এবং যাকাত দিতে বলিল। ছালাবা চিঠি দেখিয়া বলিল ইহাতো কর বৈ আর কিছু নহে ইহাতো কর বৈ আর কিছু নহে। ইহাতো কর বৈ আর কিছু নহে? যাও অন্যান্যদের নিকট হইতে আদায় করার পর আমার কাছে আসিও। তাহারা সুলামী ব্যাক্তির কাছে যাইয়া যাকাত চাহিলে সুলামী ব্যাক্তি উৎকৃষ্ট উট আনিয়া হাজির করিল এবং বলিল এইগুলি লইয়া যান। তাহারা বলিল, এই সমস্ত উট আপনার উপর ওয়াজিব নহে । এইগুলি আমরা গ্রহণ করিব না। সুলামী ব্যাক্তি বলিল, এইগুলিই নিতে হইবে। যাহাই হউক তাহারা সুলামী ব্যাক্তির নিকট হইতে যাকাত উসূল করার পর পুনরায় ছালাবা ইবনে হাতেবের নিকট গেল এবং যাকাত চাহিল। ছালাবা বলিল, চিঠিটি আমাকে দেখাও, চিঠি দেখিয়া সে বলিল ইহাতো কর সদৃশ মনে হইতেছে। আচ্ছা, এখন যাও আমি চিন্তা করিয়া লই।

যাকাত উসূলকারীদ্বয় রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট পৌছিলে তাহাদিগকে দেখা মাত্রই ছালাবার জন্য বদ দোয়া করিলেন এবং সুলামী ব্যাক্তির জন্য দোয়া করিলেন অথচ তাহারা এখনও কিছুই বলে নাই। ইহার পর তাহারা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে ছালাবা ও সুলামী ব্যাক্তির আচরণ সম্পর্কে অবহিত করিল। তখন আল্লাহ তায়ালা নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল করেন।

وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللّٰهَ لَئِنْ اٰتَانَا مِنْ فَضْلِهٖ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُوْنَنَّ مِنَ الصَّالِحِيْنَ - فَلَمَّا اٰتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهٖ بَخِلُوْا بِهٖ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُّعْرِضُوْنَ فَاَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِىْ قُلُوْبِهِمْ اِلٰى يَوْمِ يَلْقَوْنَهٗ بِمَا اَخْلَفُوا اللّٰهَ مَا وَعَدُوْهُ وَبِمَا كَانُوْا يَكْذِبُوْنَ -

অর্থ- আর তাহাদের মধ্যে কতক রহিয়াছে যাহারা আল্লাহর সহিত ওয়াদা করিয়াছিল যে, আল্লাহ যদি আমাদিগকে আপন অনুগ্রহ হইতে কিছু দান করেন তবে অবশ্যই আমরা সদকা (দান) করিব এবং নেককারদের অন্তর্ভুক্ত হইব। অতঃপর যখন আল্লাহ তায়ালা আপন অনুগ্রহ হইতে তাহাদিগকে দান করিলেন তখন তাহারা উহাতে কার্পন্য করিল এবং মুখ ফিরাইয়া পিছনের দিকে চলিয়া গেল। তারপর আল্লাহ তায়ালা ইহার পরিনামে তাহাদের অন্তরে নেফাক সৃষ্টি করিয়া দিলেন। তাঁহার সহিত সাক্ষাতের দিবস পর্যন্ত আল্লাহর সহিত ওয়াদা ভঙ্গ করার কারণে এবং মিথ্যা বলার কারণে।

উক্ত আয়াত নাযিল হওয়ার সময় রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট ছালাবার এক আত্মীয় ব্যক্তি উপস্থিত ছিল। সে উক্ত আয়াত শোনার পর সেখান হইতে উঠিয়া ছালাবার নিকট যাইয়া বলিল, হে ছালাবা! তোমার মা নাই,[১] তোমার সম্বন্ধেতো এই আয়াত নাযিল হইয়াছে।

টিকা-(১) আরবরা এই কথা ভর্ৎসনা স্বরূপ বলিয়া থাকে।

ছালাবা ইহা শুনিয়া তৎক্ষনাৎ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর খেদমতে উপস্থিত হইল এবং আরজ করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার সদকা গ্রহণ করুন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলিলেন, আল্লাহ তায়ালা তোমার সদকা গ্রহন করিতে নিষেধ করিয়াছেন। ছালাবা ইহা শুনিয়া মাথায় মাটি ঢালিতে লাগিল। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলিলেন, ইহা তোমার আমলের পরিণাম। তোমাকে আদেশ করিয়াছিলাম কিন্তু তুমি পালন কর নাই।

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ছালাবার সদকা গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিলে ছালাবা বাড়ীতে ফিরিয়া গেল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ইন্তিকালের পর হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাদিঃ)-এর কাছে সদকা লইয়া আসিল কিন্তু তিনি তাহা প্রত্যাখ্যান করেন। ইহার পর হযরত উমর (রাদিঃ)-এর খেদমতে আসিল। তিনিও প্রত্যাখ্যান করেন। অতঃপর সে হযরত উছমান (রাদিঃ)-এর যুগে মারা যায়।

এই হইল মাল ও ধনবত্তার কুফল। যাহা আপনি উপরোক্ত হাদীছ দ্বারা বুঝিতে পারিয়াছেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দারিদ্রের বরকত ও মালের কুফলের কারনেই দারিদ্রকে ধনবত্তার তুলনায় অগ্রাধিকার দান করিয়াছেন।

ইমরান ইবনে হোসাইন (রাদিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছেও আমার বেশ মর্যাদা ছিল। একদা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলিলেন, হে ইমরান! আমার কাছে তোমার বেশ মর্যাদা রহিয়াছে। আমার কন্যা ফাতেমা অসুস্থ। তুমি তাহার সেবার জন্য যাইবে কি? আমি বলিলাম, জ্বি হ্যাঁ, ইয়া রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আপনার প্রতি আমার পিতামাতা কোরবান হউক। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) -এর সহিত আমি চলিলাম। তিনি হযরত ফাতেমা (রাদিঃ)-এর বাড়ীতে যাইয়া ঘরের দরজায় করাঘাত করিলেন। এবং সালাম দিয়া বলিলেন, প্রবেশের অনুমতি আছে কি? হযরত ফাতেমা (রাদিঃ) বলিলেন, জি, হ্যাঁ। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলিলেন, আমার সঙ্গী সহ? হযরত ফাতেমা (রাদিঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনার সহিত কে? রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেলেন, ইমরান ইবনে হোসাইন। হযরত ফাতেমা (রাদিঃ) বলিলেন, আল্লাহর কসম, আমার পরনে একটি আবা ব্যতীত আর কিছু নাই। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হাতে ইশারা করিয়া বলিলেন, ইহা দ্বারা এইভাবে শরীর আবৃত করিয়া লও। হযরত ফাতেমা (রাদিঃ) বলিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ আমার শরীর তো ইহা দ্বারা ঢাকিলাম মাথা ঢাকিব কিরূপে ? তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) স্বীয় পুরাতন একটি চাদর তাঁহার দিকে ছুড়িয়া দিলেন এবং বলিলেন, ইহা দ্বারা মাথা ঢাকিয়া লও। অতঃপর হযরত রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ঘরে প্রবেশ করতঃ

সালাম দিলেন এবং অবস্থা জিজ্ঞাসা করিলেন, হযরত ফাতেমা (রাদিঃ) বলিলেন, আমি অসুস্থ অতদসঙ্গে আরেক কষ্ট হল ক্ষুধার। খাইবার কিছুই নাই। ইহা শুনিয়া রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কাঁদিয়া দিলেন এবং বলি-লেন, হে ফাতেমা। তুমি অধীর হইওনা। আমিও তিন দিন যাবৎ কিছু খাই নাই। অথচ আমি আল্লাহর কাছে তোমার চাইতেও মর্যাদাবান। আমি যদি আল্লাহর কাছে বলি তবে তিনি খাবার দান করিবেন। কিন্তু আমি আখেরাতকে দুনিয়ার তুলনায় অগ্রাধিকার ও প্রাধান্য দিয়াছি। অতঃপর হযরত ফাতেমা (রাদিঃ) -এর কাঁধে হাত রাখিয়া বলিলেন, তুমি সুসংবাদ গ্রহণ কর, তুমি জান্নাতী নারীদের সরদার হইবে। তখন হযরত ফাতেমা (রাদিঃ) বলিলেন, তাহা হইলে ফেরাউন পত্নি আছিয়া এবং ইমরান তনয়া মরিয়মের মর্যাদা কোথায় ? রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলিলেন, আছিয়া স্বীয় যুগের নারীদের সরদার মরিয়মও স্বীয় যুগের নারীদের সরদার। এমনি ভাবে খাদিজাও স্বীয় যুগের নারিদের সরদার আর তুমি হইলে তোমার যুগের নারীদের সরদার, তোমরা এমন ঘরে বাস করিবে যাহা যবরজদ প্রস্তর নির্মিত এবং ইয়াকুত খচিত থাকিবে। উহাতে কোন প্রকার শোরগোল শোনা যাইবে না বা কষ্টকর বিষয় পরিলক্ষিত হইবে না। অতঃপর বলিলেন, তুমি চাচা আবু তালেবের পুত্রকে পাইয়া সন্তুষ্ট থাক, আমি তোমাকে এমন এক ব্যক্তির কাছে বিবাহ দিয়াছি যে দুনিয়া আখেরাত উভয় জগতের সরদার।

এখন পিয়ারা নবীর কলিজার টুকরা হযরত ফাতেমা (রাদিঃ)-এর অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করুন, কিরূপে আখেরাতকে বরণ করিয়াছেন এবং দুনিয়ার মাল বর্জন করিয়াছেন। যে ব্যক্তি আম্বিয়া (আঃ) ও আউলিয়ায়ে কেরামের অবস্থা, তাঁহাদের বাণী ও তাঁহাদের সম্বন্ধে বর্ণিত ঘটনাবলী পর্যালোচনা করে সে, কখনও এই সন্দেহ পোষণ করিবে না যে দারিদ্র, মাল ও ধনবত্তার তুলনায় উত্তম। যদিও মাল সৎ পথে ব্যয় করা হয়। কেননা কমপক্ষে মালের হক আদায় করা, সন্দেহ যুক্ত জিনিষ হইতে বাঁচিয়া থাকা,সৎপথে খরচ করা, মাল ঠিক-ঠাক রাখা ইত্যাদি বিষয় আল্লাহর যিকির হইতে বিরত রাখে। কারণ আল্লাহর যিকিরের জন্য অবসর হইতে হয় আর মালের ধ্যান ও ব্যস্ততা থাকা অবস্থায় অন্তর ফারেগ এবং অবসর হইতে পারে না।

হযরত ঈসা (আঃ) এবং জনৈক সঙ্গীর বিস্ময়কর ঘটনা। লোভের ভয়ংকর পরিণতি

লাইছ (রহঃ) বর্ণনা করেন জনৈক ব্যক্তি হযরত ঈসা (আঃ)-এর কাছে আসিয়া বলে, আমি আপনার সহিত এবং আপনার সঙ্গীদের সাহচর্যে থাকিতে চাই। হযরত ঈসা (আঃ) ঐ ব্যক্তি সহ এক নদীর তীরে পৌঁছিলেন এবং নাস্তা খাইতে বসিলেন, তাহাদের সাহিত তিনটি রুটি ছিল। দুই জনে দুইটি রুটি খাইলেন এবং একটি রুটি অবশিষ্ট রহিল। হযরত ঈসা (আঃ) নদীতে পানি পান করিতে গেলেন। পানি পান করিয়া যখন ফিরিলেন তখন দেখিলেন রুটিটি সেখানে নাই। ঐ ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, রুটিটি কে নিয়াছে? সে বলিল,

আমি জানিনা। হযরত ঈসা (আঃ) ঐ স্থান হইতে চলিলেন, তাঁহার সহিত ঐ ব্যক্তিও চলিল। কিছু দূর যাওয়ার পর একটি হরিনী দেখিতে পাইলেন। হরিনীর সহিত দুইটি নবজাত বাচ্চাও ছিল। হযরত ঈসা (আঃ) তন্মধ্য হইতে একটি বাচ্চাকে ডাকিলেন। বাচ্চাটি তাঁহার কাছে আসিলে উহা জবেহ করেন এবং ভুনা করতঃ উভয়ই উহার কিছু অংশ খান, অতঃপর বাচ্চাটিকে লক্ষ্য করিয়া বলেন, তুমি আল্লাহর হুকুমে জীবিত হইয়া চলিয়া যাও। বাচ্চাটি উঠিয়া চলিয়া গেল। ইহার পর হযরত ঈসা (আঃ) ঐ ব্যক্তিকে বলিলেন, যে সত্তা তোমাকে এই নিদর্শন ও অলৌকিক ঘটনা দেখাইয়াছেন, তাহার দোহাই দিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছি, রুটিটি কে নিয়াছে বল। সে বলিল, আমি জানি না। অতঃপর হযরত ঈসা (আঃ) তাহাকে লইয়া একটি জলাশয়ের কাছে আসিলেন, পানির উপর দিয়া হাটিয়া গেলেন। জলাশয় পার হওয়ার পর তাহাকে বলিলেন, তোমাকে ঐ সত্তার দোহাই দিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছি যে, তোমাকে এই অলৌকিক ঘটনা দেখাইয়াছেন, তুমি বল রুটিটি কে নিয়াছে। সে বলিল, আমি জানিনা। অতঃপর হযরত ঈসা (আঃ) তাহাকে লইয়া একটি মরু প্রান্তরের দিকে গেলেন এবং কিছু বালি একত্র করতঃ বলিলেন, তুমি আল্লাহর হুকুমে সোনা হইয়া যাও। তৎক্ষনাৎ উহা সোনায় পরিনত হইয়া গেল। হযরত ঈসা (আঃ) উক্ত সোনাকে তিন ভাগে ভাগ করিলেন এবং বলিলেন, একভাগ আমার, এক ভাগ তোমার এবং আরেক ভাগ ঐ ব্যক্তির যে এই রুটিটি নিয়াছে। তখন সে বলিয়া উঠিল আমিই ঐ রুটি নিয়াছি। হযরত ঈসা (আঃ) বলিলেন, সম্পূর্ণ সোনাই তোমার, এই বলিয়া তিনি তাহাকে ত্যাগ করতঃ চলিয়া গেলেন।

ইহার পর মরু প্রান্তরে থাকা অবস্থায়ই তাহার কাছে অপর দুই ব্যক্তি আসিয়া উপস্থিত হইল এবং এই মূল্যবান সম্পদ দেখিয়া তাহাদের লোভ হইয়া গেল। তাহারা তাকে হত্যা করতঃ সোনাগুলি হস্তগত করার ইচ্ছা করিল। সে বলিল, আমাকে হত্যা করিও না এই সোনা আমরা তিন জনই সমভাবে ভাগ করিয়া নিব। অতএব একজনকে এই গ্রামে খাবার খরিদ করিতে পাঠাও। একজনকে খাবার খরিদ করার জন্য পাঠানো হইল। যাহাকে খাবার খরিদ করার জন্য পাঠানো হইল, সে মনে মনে বলিল এই সম্পদ তাহাদিগকে দিব কেন? খাবারে বিষ মিশাইয়া দিব। বিষ প্রয়োগে তাহাদিগকে হত্যা করতঃ সম্পূর্ণ সোনা আমি একাই নিয়া নিব। অতএব সে তাহাই করিল। অপর দিকে ঐ দুই ব্যক্তি পরামর্শ করিল যে, তাহাকে এক তৃতীয়াংশ সোনা খামাখা কেন দিব সে আসা মাত্রই খুন করিয়া ফেলিব। অতঃপর আমরা দুইজনে সম্পূর্ণ সোনার মালিক হইয়া যাইব। অতঃপর ঐ ব্যক্তি যখন খাবার লইয়া আসিল তখন তাহাকে খুন করিয়া ফেলিল। ইহার পর উক্ত বিষ মিশ্রিত খাবার খাইয়া ইহারা দুইজনও মারা গেল। সেই সোনা মরু প্রান্তরে পড়িয়া রহিল আর ঐ তিন ব্যক্তি মৃতাবস্থায় উহার পাশে পড়িয়া রহিল। কিছুদিন পর হযরত ঈসা (আঃ) যখন এই পথ দিয়া গমন করিলেন তখন তাহাদের এই অবস্থা দেখিয়া আপন সহচরদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন এই হইল দুনিয়া। অতএব তোমরা দুনিয়ার ব্যাপারে সতর্ক হও।

বাদশাহ যুলকারনাইন এর ভ্রমনকালের একটি উপদেশমূলক ঘটনা

বর্ণিত আছে, একবার বাদশাহ যুলকারনাইন এক সম্প্রদায়ের কাছে আসিলেন। তাহাদের কাছে দুনিয়ার কোন সম্পদ ছিল না। তাহারা কবর খনন করিত। সকালে ঐ কবরের কাছে যাইয়া কবর ঝাড়ু দিত এবং উহার পাশে নামায পড়িত। তাহাদের খাদ্য ছিল পশুর ন্যায় শাকসব্জি। আল্লাহ কুদরতে সবধরনের শাক সব্জি সেখানে বিদ্যমান ছিল। যুলকার নাইন তাহাদের বাদশাহকে ডাকাইয়া আনার জন্য পাঠাইলে। বাদশাহ বলিল, তাহার কাছে আমার কোন প্রয়োজন নাই। তাহার প্রয়োজন থাকিলে আমার কাছে আসিতে বল। যুলকার নাইন এই কথা শুনিয়া বলিলেন, সে যথার্থ বলিয়াছে। অতঃপর তিনি নিজেই তাহার কাছে গেলেন এবং বলিলেন, আমি তোমাকে ডাকাইয়া পাঠাইলাম তুমি যাইতে আস্বীকার করিয়াছ। এখন আমি নিজেই আসিয়াছি। সে বলিল, হ্যাঁ, আপনার কাছে আমার প্রয়োজন থাকিলে অবশ্যই যাইতাম। যুলকার নাইন বলিলেন, কি ব্যাপার তোমাদিগকে যে অবস্থায় দেখিতেছি, এমন অবস্থায় আর কোন সম্প্রদায়কে দেখিতে পাই নাই? সে বলিল, কি অবস্থা ? যুলকারনাইন বলিলেন, তোমরা দুনিয়ার কোন সম্পদ ভোগ করিতেছ না, সোনারূপা ব্যবহার করিতেছ না ? উত্তরে সে বলিল, আমরা সোনা রূপা এই জন্য অপছন্দ করি যে, কাহাকেও ইহা দান করা হইয়াছে সে উহার চাইতে উত্তম জিনিস কামনা করিয়াছে। যুলকারনাইন জিজ্ঞাসা করিলেন,কি ব্যাপার? তোমাদিগকে দেখিতেছি, তোমরা কবর খনন করিয়া রখিয়াছ। সকালে ঐ কবর পরিস্কার কর এবং উহার পাশে নামায পড়? উত্তরে বলিল, আমরা ইহা এইজন্য করি যে, কবরের দিকে তাকাই তবে দুনিয়ার প্রতি যদি কোন লোভ হইয়া থাকে তবে উহা আর থাকিবে না। যুলকারনাইন জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা শুধু শাকসব্জি খাও, পশুপালন করতঃ উহার গোশত খাওনা কেন এবং উহাকে সাওয়ারী হিসাবে ব্যবহার কর না কেন ? কি ব্যাপার ? উত্তরে সে বলিল, আমরা ইহা চাইনা যে, আমাদের পেট চতুস্পদ জন্তুর কবর হউক। আমরা দেখিতে পাই যে, যমীনের শাক-সব্জি দ্বারাই আমাদের প্রয়োজন মিটিয়া যায় আর মানুষের জীবন ধারনের জন্য সাধারণ খাবারই যথেষ্ট। কারণ গলদেশ অতিক্রম করার পর সব এক রকম হইয়া যায়। অতঃপর সে যুলকারনাইনের পিছন হইতে একটি মাথার কঙ্কাল হাতে লইয়া যুলকারনাইনকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, আপনি কি জানেন এই ব্যক্তি? কে যুলকারনাইন বলিলেন, না আমি জানিনা। সে বলিল, এই ব্যক্তি একজন বাদশাহ ছিল। আল্লাহ তাহাকে রাজত্ব দান করিয়াছিলেন। কিন্তু সে দুনিয়াতে জুলুম অত্যাচার শুরু করিয়া দেয়। আল্লাহ তায়ালা তাহার উপর মৃত্যুকে চাপাইয়া দেন। তাহার কৃতকর্ম সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা অবগত আছেন। কেয়ামতের দিন উহার সাজা দিবেন। ইহার পর সে আরেকটি মাথার কঙ্কাল হাতে লইয়া বলিল, এই ব্যক্তিকে আপনি চিনেন কি? যুলকারনাইন বলিলেন, না। সে বলিল, সে এক বাদশাহ। পূর্ববর্তী বাদশাহর পরে তাহার আগমন হয়। পূর্ববর্তী বাদশাহর জুলুম অত্যাচার তাহার জানা ছিল, তাই সে মানুষের সহিত বিনয় ও ন্যায় বিচার করে।

আল্লাহ্ তায়ালা তাহার আমল সম্বন্ধেও অবহিত আছেন। কিয়ামতের দিন ইহার প্রতিদান দিবেন। অতঃপর যুলকারনাইনের মাথার দিকে ইঙ্গিত করিয়া বলিল, হে যুলকারনাইন ইহাও এই খোপড়িদ্বয়ের ন্যায় হইয়া যাইবে। অতএব খুব চিন্তা করিয়া চলিতে হইবে। ইহার পর যুলকারনাইন বলিলেন, তুমি আমার সাহচর্যে থাকিবে কি ? আমি তোমাকে স্বীয় ওজীর করিয়া লইব অথবা আল্লাহ তায়ালা যে সম্পদ দান করিয়াছেন, উহাতে তোমাকে অংশীদার করিয়া লইব। সে উত্তরে বলিল, আমি আর আপনি এক জায়গায় একত্রে থাকিতে পারি না, যুলকার নাইন জিজ্ঞাসা করিলেন, কেন? সে বলিল, এই জন্য যে, সমস্ত লোক আপনার দুশমন আর আমার বন্ধু। যুলকারনাইন জিজ্ঞাসা করিলেন কেন? সে বলিল, যেহেতু আপনার কাছে দুনিয়া রহিয়াছে আর আমি দুনিয়াকে পদাঘাত করিয়াছি এবং আমি দরিদ্র ও অভাবগ্রস্ত। অতঃপর যুলকারনাইন বিস্মিত হইয়া এবং উপদেশ গ্রহণ করতঃ সেখান হইতে প্রত্যাবর্তন করিলেন।

সমাপ্ত